POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ
وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

তাহারা কি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করিবে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? বস্তুত আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(আল মায়েদা: ৭৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 34

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

26 আগস্ট, 2021 ● 16 মহররম 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সদকা প্রদানে শীঘ্রতা করার প্রেরণা

১৪১৯) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে রসুলুল্লাহ! কোন প্রতিদানের ক্ষেত্রে কোন সদকা শ্রেয়? আঁ হযরত (সা.) উত্তর দিলেন, 'তুমি যখন সদকা কর যখন সুস্থ-সবল থাক, সম্পদ অর্জনের বাসনা রাখ অথচ কৃপণ, অভাবের আশঙ্কা কর অথচ সম্পদশালী হওয়ার আশা রাখ আর (সদকা করতে) এতটা বিলম্ব করো না যে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত আর তুমি বলছ,অমুক অমুক ব্যক্তিকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে,অথচ সেই সম্পদ অমুকের তো কবেই হয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘ হাত-এর অর্থ বদান্যতা

১৪২০) হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী (সা.) এর কতিপয় স্ত্রীগণ নবী (সা.) কে বললেন- 'আমাদের মধ্য থেকে কে আপনার সঙ্গে দ্রুত সাক্ষাত করবে?' আঁ হযরত (সা.) উত্তর দিলেন, 'যার হাত বেশি লম্বা।' একথা শুনে তারা একটি কাঠি নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে শুরু করল। হযরত সোওদা (রা.)-এর হাত সব থেকে বেশি লম্বা ছিল। আমরা পরে জানতে পারি যে হাতের দৈর্ঘ্য বলতে সদকাকে বোঝানো হয়েছিল। আর আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সেই স্ত্রীরা মিলিত হয়েছেন যারা সদকাকে ভীষণ পছন্দ করতেন।'

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৩ই জুলাই ,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করে নিবে, সে সেই সব কল্যাণরাজিতে ধন্য হবে যা পূর্ববর্তী সত্যবাদীদেরকে দেওয়া হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পুণ্যকর্ম চেনার উপায়

আর এটা এজন্য যে আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতকে কুরআন শরীফ দান করেছেন যা প্রকৃত জ্ঞানের নির্ঝর ও উৎসমুখ। যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত এই তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে- যা প্রকৃত তাকওয়া এবং খোদাভীতির মাধ্যমে লাভ হয়, সে সেই জ্ঞান লাভ করে যা তাকে বনী ইসরাইলের নবীদের সমকক্ষ বানিয়ে দেয়। একথা শতভাগ খাঁটি যে, এক ব্যক্তিকে কোন অস্ত্র দিলে সে যদি সেই অস্ত্রকে কাজে না লাগায়, তবে সেটা তার নিজের দোষ, অস্ত্রের দোষ নয়। বর্তমানে পৃথিবীতে এই একই অবস্থা বিরাজ করছে। কুরআন শরীফের ন্যায় অতুলনীয় নেয়ামত, যা তাদেরকে সকল পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দেয় এবং অন্ধকার থেকে বের করে আনে, তা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানেরা সেটিকে ত্যাগ করেছে, এর পবিত্র শিক্ষামালাকে অগ্রাহ্য করেছে। পরিণামে তারা ইসলাম থেকে একেবারে দূরে ছিটকে পড়েছে। এমনকি এখন যদি তাদের সামনে প্রকৃত ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়= যেহেতু তারা এর থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অনভিজ্ঞ, তাই তারা প্রকৃত মোমেনকেও কাফের বলে বসে।

ওলী হওয়ার জন্য খোদা প্রদত্ত শক্তিসমূহকে কাজে লাগাও।

অনেক মানুষ আছে যারা উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করে। তারা জাগতিক খ্যাতি, সম্মান ও সম্পদের বাসনা করে। এই ধরণের বাসনা এবং তা পূণ করার তাড়নায় তারা নিজেদের জীবন শেষ করে দেয়। তাদের কামনা=বাসনা অন্তহীন, আর এরই মাঝে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তো যাবতীয় শক্তিবৃত্তি দান করেছিলেন। তারাও সত্যকে পেয়ে যেত, যদি সেই সব শক্তিগুলিকে কাজে লাগাত । আল্লাহ্ তা'লা কোন কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু তারাই এই শক্তিগুলিকে কাজে লাগায় নি। এটি তাদের দুর্ভাগ্য। সৌভাগ্যবান ও ধন্য সেই যে এই শক্তিগুলিকে কাজে লাগায়। অনেক মানুষ এমনও আছে যদি তাদেরকে বলা হয়, 'খোদা তা'লাকে ভয় কর, এই বিষয়গুলি মেনে চল আর এগুলি থেকে বিরত থাক'- তখন তারা উত্তর দেয়, 'আমরা কি আর ওলী হব নাকি? আমার মতে এই ধরণের কথা 'কুফর', খোদা তা'লা সম্পর্কে অসৎ চিন্তাধারা পোষণ করা। খোদা তা'লার কাছে কি কোন জিনিসের অভাব আছে? এটি কোন সরকারি সীমিত চাকরী নয় যা শেষ হয়ে যাবে। বরং যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করে নিবে, সে সেই সব কল্যাণরাজিতে ধন্য হবে যা পূর্ববর্তী সত্যবাদীদেরকে দেওয়া হয়েছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৮)

সত্যকে স্বীকার করতে হলে অনাড়ম্বরপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস অবলম্বন, জগতের মোহ থেকে দূরে থাকা এবং উচ্চাশা থেকে বিরত থাকা জরুরী। সত্যান্বেষী ব্যক্তির এই সব বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকা জরুরী। কেউ যদি এই সব বিষয়গুলি থেকে বিরত না থাকে, তবে তার সত্যান্বেষণ বৃথা কর্ম। তার কাছে সত্য প্রকাশিত হলেও তা সে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হুজরাতের ২ নং আয়াত ذُرِّهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং করবে। তবু তারা ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে না। ইউরোপবাসীরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। কেননা সমাজে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের খওয়া দাওয়া কারণে, নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যে কারণে এবং নিজেদের অলীক কামনা বাসনার কারণে মুসলমান হয় না। অর্থাৎ পূর্বের আয়াতের অর্থে যে প্রশ্ন উঠছিল তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ লোকেরা যখন কামনা করে এবং করবে, 'আমরা যদি মুসলমান হতাম! তারা মুসলমান হয় না কেন? বলা হয়েছে যে, তাদের বিলাসিতা, সম্পদের লোভ এবং দুরাশাই তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই আয়াত থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সত্যকে স্বীকার করতে হলে অনাড়ম্বরপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস অবলম্বন, জগতের মোহ থেকে দূরে থাকা এবং উচ্চাশা থেকে বিরত থাকা জরুরী। সত্যান্বেষী ব্যক্তির এই সব বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকা জরুরী। কেউ যদি এই সব বিষয়গুলি থেকে বিরত না থাকে, তবে তার সত্যান্বেষণ বৃথা কর্ম। তার কাছে সত্য প্রকাশিত হলেও তা সে গ্রহণ করা

এরপর ৮ এর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

এর পাশাপাশি সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গেও বিশ্বাস ও অনুরাগের সম্পর্ক বজায় রেখে খিলাফতের সঙ্গে পূর্ণ আনুগত্য যেন জীবনের রীতি ও অংশ হয়।। জামাতের ব্যবস্থাপনা যেন আপনাদের দৃষ্টিতে এবং জীবনে যাবতীয় বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার পায়। আপনাদের মধ্যে তখনই ওয়াকফে নও-এর মহান দায়িত্বকে উত্তমরূপে পালন করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে যখন আপনাদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে । আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আপনাদের জীবনকে তদনুরূপ করে তুলতে হবে, ইসলামের শিক্ষা যা আমাদের কাছে দাবি করে। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে আপনাদের দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিলক্ষিত হওয়া দরকার। অন্যথায় মানুষ আপনাদের প্রতি দোষারোপ করার সুযোগ পাবে এবং বলবে এই ওয়াকফে নও-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নত মানের নয়।"

(যুক্তরাজ্যে বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ, প্রদত্ত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১১)

তিনি আরও বলেন: " সব সময় নিজেদের ওয়াকফে নও-এর অঙ্গীকার স্মরণে রাখবেন। এবং এও স্মরণে রাখবেন যে, এই অঙ্গীকার খোদা তা'লার সঙ্গে যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। তাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নয়। তিনি আপনাদের সমস্ত কাজ লক্ষ্য করছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন তার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে। এই কারণে এটি একটি বিরাট বড় দায়িত্ব যা ওয়াকফে নওদের উপর অর্পিত হয়েছে। অতএব এই অঙ্গীকার পুর্ণ করার জন্য এর গুরুত্ব এবং প্রকৃত অর্থ বোঝা দরকার। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা খুব শীঘ্রই কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করবে বা হয়তো ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন। এই জন্য আপনাদের কর্তব্য হল, প্রতিদিন নিজেদের বিষয়ে পর্যালোচনা করা এবং দেখা যে, সত্যিই কি আপনারা এই অঙ্গীকার পুর্ণ করছেন ? আপনারা কি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনে ক্রমশঃ উন্নতি করছেন? তাকওয়ার পথে কি পরিচালিত হচ্ছেন। যদি এই প্রশ্নগুলির উত্তর 'না' হয় তবে আপনাদের ওয়াকফ করা জামাতের কোন উপকারে আসবে না। "

(ওয়াকফীনে নওদের বাৎসরিক ইজতেমায় হুযুর আনোয়ারের ভাষণ, প্রদত্ত: ৬ই মে, ২০১২)

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আমাদের সাথে ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন। এবং তিনি আমাদেরকে এমন নির্দেশাবলী দিয়ে থাকেন যেগুলি পালন করার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের উপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি ভাষণে উপদেশ দিয়ে বলেন:

বর্তমানে ইসলামের উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং ইসলামের বিরোধীতায় কত কি-ই না বলা ও লেখা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনাদেরকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। ইসলামী শিক্ষাকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ প্রচেষ্টা করা উচিত। কিন্তু একজন ওয়াকফে নও-এর ভূমিকা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি এবং স্পষ্ট হওয়া উচিত। কারণ,ওয়াকফে নও-দের পিতামাতা এই অঙ্গীকার করেছিল যে, তাদের সন্তানের জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গিত থাকবে। পনেরো বছর বয়সে উপনীত হওয়ার উপর আপনারা নিজেদের অঙ্গীকারের নবায়ন করেছেন যে, প্রতিটি মূহুর্ত ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থাকব। অতএব সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে নিজেদের দায়িত্বাবলী বুঝে নিন। আপনারা যেখানে বসবাস করেনন সেই পাশ্চাত্যের সমাজে নিজেদেরকে এমন আলোর প্রদীপ রূপে উপস্থাপন করুন যার মধ্যে জাগতিকতার প্রতি মোহ এবং ক্রীড়া-কৌতুকের কোন উপাদান থাকে না বরং প্রকৃতই নিজেদেরকে আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত এক আলোক বর্তিকায় রূপায়িত করুন।

আমি দোয়া করি আপনাদের সবার জীবনে এই জ্যোতি সৃষ্টি হোক। আপনারা যদি এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেন, তবে ইনশা আল্লাহ্ আপনারা আমার এবং অনাগত খলীফাদের দুশ্চিন্তা লাঘবকারী হয়ে উঠবেন। কেননা একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ জ্বলে উঠে। অর্থাৎ নমুনা দেখে নমুনা গ্রহণ করা হয়। আপানদের মধ্যে যারা বড় তারা ওয়াকফে নও তাহরীকের প্রথম ফসল। এই কারণে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা আপনাদের উপর নির্ভর করছে। আপনাদের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করেই সেই প্রবণতা সৃষ্টির ভিত রচিত হবে। আমি আপনাদেরকে বলছি, আগুয়ান হন এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী কান্ডারী হয়ে উঠুন। আপনি মুবাল্লিগ, ডাক্তার, শিক্ষক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী যাই হন কেন, যে কর্মক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন, নিজেদের উৎকৃষ্ট কার্যকলাপের ছাপ রাখুন। এমন নমুনা দেখান যে, কেবল বর্তমান প্রজন্মই নয় বরং ভবিষ্যত প্রজন্মও আপনাদের জন্য দোয়া করে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এই সমস্ত দায়িত্বাবলী উত্তমরূপে পালন করার তৌফিক দান করুন।

(ওয়াকফে নও-এর সালানা ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ, প্রদত্ত: ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১১)

প্রশ্নোত্তর সভা

* একজন ওয়াকফে নও হুযুর আনোয়ার (আই.) কে প্রশ্ন করেন যে, কুরআন করীমের যে আয়াতসমূহে যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে ইসলামের নিন্দুকরা সেগুলির উপর আপত্তি করলে আমরা তাদের এই উত্তর দিয়ে থাকি যে, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় সেই সময় মক্কার কুফ্ফাররা মুসলামনদের উপর অবর্ণনীয় নিপীড়ন চালাচ্ছিল। আঁ হযরত (সা.) এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে যখন মক্কার কুফ্ফাররা বিতাড়িত করল এবং তাঁরা মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করল, সেখানেও তারা মুসলমানদেরকে শান্তিতে থাকতে দিল না। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতির জন্য এই আয়াত নাযেল করলেন। এই উত্তর শুনে নিন্দুকেরা বলে, আপনারা তো এই দাবি করছেন যে, কুরআন করীমের শিক্ষা সকল যুগের জন্য এবং বর্তমানেও এর শিক্ষা দৈনন্দিন বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় কুরআনের এই আয়াতগুলির সঙ্গে বর্তমান যুগের জীবনযাপনের কিসের সম্পর্ক?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমতঃ ইসলামের উপর যারা আপত্তি করে তাদেরকে বলুন যে, কুরআন করীমে দুই হাজারের বেশি আয়াত আছে যেগুলিতে কোন না কোন ভাবে জেহাদের উল্লেখ রয়েছে। জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেক জিহাদই যুদ্ধ নয়। অপরদিকে কুরআন করীমের তুলনায় বাইবেলে তিন গুণ বেশি অর্থাৎ পাঁচ হাজার বা এর থেকে বেশি এমন আয়াত রয়েছে যেখানে উগ্রতাপ্রিয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইঞ্জিলে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি একগালে চড় মারে তবে দ্বিতীয় গালটিতেও চড় মারতে দাও। এই বিষয়েও ২৯০ টি বা ২৯১ টি এমন আয়াত রয়েছে। এটি তো হল অভিযোগমূলক উত্তর।

হুযুর বলেন: দ্বিতীয় কথা হল, ১৩ বছর পর্যন্ত আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর অত্যাচার হতে থাকল। কিন্তু তবুও আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি। যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাথীরা হিজরত করলেন। হিজরত করার দেড় বছর পর কুফ্ফাররা আক্রমণ করলে কুরআন করীমের এই আয়াত নাযেল হয় যাতে মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। সুরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের আদেশ দিলেন। আর এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে রক্ষা করা। এই আয়াতে লেখা আছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের পরিস্থিতিতে, মন্দির, মসজিদ, গীর্জাঘর, ইহুদীদের উপাসনাগার কোন কিছুই সুরক্ষিত থাকবে না। সেই চরম মূহুর্তে যখন অনুমতি দেওয়া হয় তা ছিল ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রকৃত ইসলামি ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। তবে পাশ্চাত্যবিদদের ইতিহাস ছাড়া, যারা নিজেদের ইতিহাসে একথা প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম আক্রমণ করেছে। অথচ ইসলাম কখনও আক্রমণ করে নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য এবং নির্যাতন নিপীড়ন করার জন্য তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে আঁ হযরত (সা.) কোন উত্তর দেন নি। এই কারণেই এই ধরণের একটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আঁ হযরত (সা.) বললেন, এখন আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আর সেটি হল কুরআন করীমের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য সংগ্রাম বা জিহাদ। অতঃপর হুদাইবিয়ার সন্ধির পর শান্তি ও নিরাপত্তার কিছু সময় অতিবাহিত হল। এই সময়কালে ইসলাম ধর্ম যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের থেকে অনেক দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। অতএব যুদ্ধ বা উগ্রবাদের কারণে ইসলামের প্রসার হয় নি।

এরপর হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইরান আক্রমণ করলে তিনি (রা.) কেবল সেই আক্রমণের জবাব দিয়েছিলেন। মুসলমান সেনা ইরানের সীমান্তে গিয়ে থিতু হয়। সেই সময়ও যখন ইরানের সেনা আক্রমণ করে চলেছিল হযরত উমর মুসলমান সেনাদের এই নির্দেশই দিচ্ছিলেন যে, তোমরা প্রতি আক্রমণ করতে গিয়ে তাদের সীমা অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করে যেও না। কেবল প্রতিরক্ষা কর। কিন্তু ইরানীদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত

(এরপর ৯ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

১৪ হিজরী সনে হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খিলাফতকালে মুসলমান এবং ইরানীদের মাঝে কাদসিয়া নামক স্থানে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার ফলে ইরানী সাম্রাজ্য মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসে।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত কাল প্রায় সাড়ে ১২ বছর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বিজিত অঞ্চলের মোট আয়তন দাঁড়ায় বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য। ”

আল্লাহ্ তা'লা মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না, বরং মন্দকে পুণ্য দ্বারা প্রতিহত করেন। আল্লাহ্ তা'লা এবং বান্দার মাঝে আনুগত্য ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। ..... তুমি এক কঠিন এবং গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছ, অতএব নিজ সত্তা এবং নিজ সাথীদের মাঝে পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টি কর এবং এর মাধ্যমে বিজয় যাচনা কর। আর স্মরণ রেখ! সকল অভ্যাস সৃষ্টির জন্যই একটি মাধ্যম থাকে। আর পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টির মাধ্যম হল, ধৈর্য। ধৈর্য ধারণ করলে পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টি হবে। [হযরত উমর (রা.)]

কাদসিয়ার যুদ্ধে ইরানি বাহিনীর মধ্য থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্য পরস্পর শিকলাবদ্ধ ছিল, যাতে কেউ পলায়ন করার সুযোগ না পায়। হযরত সাআদ (রা.) মুসলমানদেরকে সূরা আনফাল পড়ার নির্দেশ দেন, তিলাওয়াত করা হলে মুসলমানদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

এই মহান পরিবর্তন মুসলমানদের মাঝে সাধিত হওয়ার কারণ কী ছিল? এর কারণ হল, কুরআনের শিক্ষা তাদের স্ব ভাব-চরিত্রে এক বিপ্লব সাধন করেছিল। তাদের তুচ্ছ জীবনে তা এক মৃত্যু আনয়ন করেছিল আর তাদেরকে এক উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের উচ্চ মার্গে উপনীত করেছিল; এ কারণেই এই বিপ্লব সাধন হয়েছিল।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৩জুলাই, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২৩ ওয়াফা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে আমরা হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করছি। তাঁর যুগে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের কথা হচ্ছিল। আজও সে বরাতেই বর্ণনা অব্যাহত থাকবে। একটি যুদ্ধের নাম হল,'বুয়ায়েব'- এর যুদ্ধ যা ১৩ হিজরী সনে আর কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৬ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। গত খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছে, জিসর বা জিসরের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর হযরত মুসান্না (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে যুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) দূতকে বলেন, তুমি তোমার সঙ্গীদের নিকট ফিরে যাও আর তাদেরকে বল, ইসলামী বাহিনী যেখানে রয়েছে সেখানেই যেন অবস্থান করে, শীঘ্রই সাহায্য পৌঁছে যাবে।

(আল আখবারুত তওয়াল, প্রণেতা- আবু হানিফা দিনোরী, পৃ: ১৬৬-১৬৭)

জিসরের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে হযরত উমর (রা.) ভীষণ কষ্ট পান। তিনি (রা.) গোটা আরবে বক্তা প্রেরণ করেন যারা তেজদীপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র আরবকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। আরবের বিভিন্ন গোত্র জাতিগত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য দলে দলে আসতে আরম্ভ করে। তাদের মাঝে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোত্রও ছিল। শুধু মুসলমানরাই ছিল না বরং খ্রিস্টানদের কিছু গোত্রও ছিল। হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের একটি সেনাদল ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন আর হযরত মুসান্না (রা.)ও ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে সেনা ঐক্যবদ্ধ করেন। রুস্তম এ সংবাদ পাওয়ার পর মেহরানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করে। কূফার তিন মাইল অদূরে হীরা নামক শহরের পাশে বুয়ায়েব অবস্থিত। বুয়ায়েব হল, কূফার নিকটবর্তী একটি নদী যা ফুরাতের শাখা নদী। উভয় পক্ষই এই স্থানে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এর নিকটেই পরবর্তীতে কূফা শহর গড়ে উঠেছিল। ইরানী সেনাপতি মেহরান (যুদ্ধ শুরুর পূর্বে) জানতে চায়, আমরা নদী পার হয়ে আসব নাকি তোমরা আসবে? হযরত মু সান্না (রা.) বলেন, তোমরা আস। পূর্বের যুদ্ধে মুসলমানরা নদী অতিক্রম করে গিয়েছিল কিন্তু এবার তিনি সমরকৌশলের অংশ হিসেবে তাদের বলেন যে, তোমরা আস। হযরত মুসান্না (রা.) নিজ সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করেন এবং তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান, আর এরপর এদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য পৃথক পৃথক অভিজ্ঞ নেতা নিযুক্ত করেন। এরপর সামুস নামের নিজের বিখ্যাত ঘোড়ায় আরোহণ করে ইসলামী সেনাবাহিনীর সারিগুলো ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি পতাকার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ-সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতায় এভাবে তাদের মনোবল দৃঢ় করেন যে, আমি বিশ্বাস করি- তোমাদের কারণে আজ আরবদের যেন দুর্নাম না হয়। খোদার কসম! আমি আজ আমার নিজের জন্য কেবল সেসব জিনিসই পছন্দ করি যা তোমাদের সাধারণ কোন মানুষের জন্য আমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। অর্থাৎ আমি এবং তোমরা সবাই বরাবর বা সমান। এর ফলে ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ সেনারা তাদের প্রিয় নেতার ডাকে সর্বান্তকরণে সাড়া দেয় আর কেনই বা দেবে না? তিনি যে তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে সর্বদাই তাদের সাথে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতেন এবং সুখদুঃখে তাদের সাথে থাকতেন আর তাঁর কোন কথায় অঙ্গুলিনির্দেশের সাধ্য কারও ছিল না। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭২) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৬)

সেনাবাহিনীকে দিকনির্দেশনা দিয়ে হযরত মুসান্না (রা.) বলেন, আমি তিনবার তকবীর দিব, এর মধ্যে তোমরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে আর চতুর্থ তকবীর শোনামাত্রই শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হযরত মুসান্না (রা.) প্রথমবার নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতেই ইরানী সেনাবাহিনী চটজলদি আক্রমণ করে বসে, এজন্য মুসলমানরাও (কিছুটা) তড়িঘড়ি করে এবং প্রথম তকবীর দেওয়ার পরই বনু ইজল গোত্রের কেউ কেউ নিজেদের সারি ভেঙ্গে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। এভাবে সারিগুলোর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন হযরত মুসান্না (রা.) এক ব্যক্তিকে তাদের নিকট এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেন যে, সেনাপতি তোমাদের সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলমানদেরকে আজ লাঞ্ছিত করো না, ফলে সেই গোত্র নিজেদের সামলে নেয়। এরপর এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় আর ইরানীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, এই যুদ্ধে ইরানীদের মৃতের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ইরানী সৈন্যবাহিনীর প্রধান মেহরানও এই যুদ্ধে নিহত হয়। এই যুদ্ধকে 'ইয়াওমুল আশার'ও বলা হয়, কেননা এ যুদ্ধে একশ'জন এমন লোক ছিলেন যাদের প্রত্যেকে দশ জন করে সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। ইরানী সৈন্যরা পরাজিত হয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার উদ্দেশ্যে

পুলের দিকে ছুটে পালাতে থাকে যেন তারা নদী পার হতে পারে, কিন্তু হযরত মুসান্না (রা.) তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং পুল পার হবার পূর্বেই তাদেরকে ঘিরে ফেলেন আ র নদীর ওপরের পুল ভেঙে দিয়ে অনেক ইরানী সৈন্যকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে হযরত মুসান্না (রা.) দুঃখ করে বলতেন, আমি পরাজিত সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করে ভুল করেছি! এমনটি করা আমার উচিত হয় নি। তিনি (রা.) বলতেন, আমি অনেক বড় ভুল করেছি, কেননা যাদের লড়াই করার শক্তি নেই তাদের সাথে লড়াই করাটা আমার জন্য শোভনীয় নয়। ভবিষ্যতে আমি কখনও এমনটি করব না। অতঃপর তিনি (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নসীহত করে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কখনও এমনটি করবে না এবং এ বিষয়ে আমার অনু করণ করবে না। পলায়নরত লোকদের পিছু ধাওয়া করার মত ভুল কাজটি আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এমনটি হওয়া উচিত হয় নি। মূলত এটিই হল, ইসলামের নৈতিক শিক্ষা। এই যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীর অনেক বড় বড় কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব যেমন- খালীদ বিন হেলাল এবং মাসউদ বিন হারেসাও শহীদ হয়েছিলেন। হযরত মুসান্না (রা.) শহীদদের জানাযা পড়ান এবং বলেন, খোদার কসম! কেবল এ বিষয়টিই আমার দুঃখকষ্ট লাঘবের কারণ হয় যে, এসব লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, পরম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছেনএবং অটল ও অবিচল থাকেন আর তারা কোন প্রকার বিচলিত হয় নি এবং দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হন নি। এছাড়া এ বিষয়টিও আমার দুঃখকে হালকা করে যে, শাহাদত পাপমোচনের জন্যপ্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হয়ে থাকে।

এই যুদ্ধের স্মৃতিচারণে ঐতিহাসিকরা একটি ঘটনার উল্লেখ করে থাকেন যার মাধ্যমে মুসলমান নারীদের সাহসিকতা ও বীরত্বের ওপর আলোকপাত হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাওয়াদেস নামক দূরবর্তী একটি স্থানে মুসলমান সেনাদলের নারী ও শিশুদের ক্যাম্প বা শিবির ছিল। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের একটি সৈন্যদল ঘোড়া হাঁকিয়ে ক্যাম্পের সামনে পৌঁছলে মুসলমান নারীরা ভুলবশত মনে করে, এটি হয়তো সৈন্যবাহিনী যারা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে এসেছে। তখন তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শিশুদের বেষ্টনিতে নিয়ে নেন এবং পাথর ও লাঠিসোটা নিয়ে মরতে-মারতে প্রস্তুত হয়ে যান। সেনাদলটি নিকটে পৌঁছার পর তারা বুঝতে পারেন, এরা তো মুসলিম বাহিনী। (এ অবস্থা দেখে) এই দলের নেতা আমর বিন আব্দুল মসীহ্ অবলীলায় বলে উঠেন, আল্লাহ্‌র বাহিনীর নারীদের এটিই শোভা পায়।

বুয়ায়েব এর যুদ্ধ শেষ হয় ঠিকই কিন্তু এর রেখে যাওয়া প্রভাব ছিল সুগভীর। ইরানের ইসলামী অভিযানে এর পূর্বে কখনোই এত প্রাণহানি ঘটে নি। এ যুদ্ধের অন্য যে প্রভাব পড়ে তা হল, ইরাকের অধিকাংশ স্থানে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয় এবং ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চল দজলা পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এছাড়া সামান্য যুদ্ধের পরই আশপাশের সেসব এলাকার ওপরও নতুনভাবে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় যা (তারা) পূর্বে ছেড়ে এসেছিল। পক্ষান্তরে ইরানী সেনাবাহিনী পিছুহটে গিয়ে দজলার ওপারে চলে যাওয়াতেই মঙ্গল নিহিত বলে মনে করে। এই বিজয়ের পর মুসলমানেরা ইরাকের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭২) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৩-৩৭৪) (সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আস সালাবী, পৃ: ৩৬১-৩৬৩) (আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলী নুমানী, পৃ: ৮২-৮৪) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৮৮-২৯১) (তারিখে তাবারী, (উর্দুতে অনুদিত), ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ২৩৭-২৩৮, ২৪০-২৪১) (তারিখে ইসলাম বি আহদে হযরত উমর (রা.), নিবন্ধকার- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির, পৃ: ২৮-২৯)

এরপর ১৪ হিজরী সনে কাদসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাদসিয়া বর্তমান ইরাকের একটি স্থান যা কূফা থেকে ৪৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ১৪ হিজরী সনে হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খিলাফতকালে মুসলমান এবং ইরানীদের মাঝে কাদসিয়া নামক স্থানে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার ফলে ইরানী সাম্রাজ্য মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসে। পারস্যবাসী যখন মুসলমানদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয় তখন তারা তাদের দুই নেতা রুস্তম এবং ফেরোজানকে বলে, তোমরা উভয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত রয়েছ আর এভাবে তোমরা দু'জনই পারস্যবাসীকে দুর্বল করে শত্রুদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছ। এখন পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে যে, আমরা যদি এভাবেই চলতে থাকি তাহলে ইরান ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা বাগদাদ, মিদিয়ানের নিকটবর্তী অঞ্চল সাবাত এবং বাগ দাদ ও মসূ ল এর মধ্যবর্তী অঞ্চল তিকরিত যা বাগদাদ থেকে ৩০ ফারসাখ, অর্থাৎ ৯০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি বিখ্যাত শহর। এরপর এখন কেবল মিদিয়ান শহরই বাকী রয়ে গেছে। তারা বলে, তোমরা উভয়ের ঐক্যমত না হলে প্রথমে আমরা তোমাদের দু'জনকে হত্যা করব, এরপর নিজেরা ধ্বংস হয়েই ক্ষান্ত হব, অর্থাৎ এরপর আমরা নিজেরাই যুদ্ধ করব। রুস্তম এবং ফেরোজান বোরানকে পদচ্যুত করে ইয়াযদাজারকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়, তখন তার বয়স ছিল ২১ বছর। এরপর সমস্ত দুর্গ এবং সেনা ছাউনিগুলোকে মজবুত করে দেওয়া হয়। হযরত মুসান্না (রা.) যখন পারস্যবাসীদের এসব কর্মকান্ড সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-কে অবহিত করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, খোদার কসম! অনারব বাদশাহ্ দের মোকাবিলা আমি আরব নেতৃবৃন্দ ও বাদশাহ্ দের মাধ্যমেই করাব। অতএব সকল নেতা, বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ, সম্মানিত বক্তা ও কবিকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। সেই সাথে হযরত মুসান্না (রা.)-কে এই নির্দেশ দেন যে, অনারব অঞ্চল থেকে বের হয়ে তোমরা সেসব উপকূলীয় অঞ্চলে চলে আসো যা তোমাদের এবং তাদের সীমান্তের নিকটবর্তী। রবীয়া এবং মুজার গোত্রের লোকদেরকেও (তিনি) সাথে নেওয়ার আদেশ দেন।

(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২২৯) (মুজামুল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৭) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৮৮-২৯১)

হযরত উমর (রা.) আরবের চতুর্দিকে নেতা প্রেরণ করে গোত্রপতি ও নেতৃবৃন্দকে মক্কায় একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। হজ্জ নিকটবর্তী হওয়ায় হযরত উমর (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হজ্জের সময় আরব গোত্রগুলো সবদিক থেকে একত্রিত হয়। তিনি যখন হজ্জ থেকে ফিরে আসেন তখন মদীনায় অনেক বড় এক সেনাদল সমবেত ছিল। হযরত উমর (রা.) নিজে সেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন আর হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় নেতা নিযুক্ত করে তিনি (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেন এবং সিরারে গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেন। সিরারও মদীনা থেকে তিন মাইলের দূরত্বে অবস্থিত একটি ঝর্ণা। তিনি বলেন, তখনও হযরত উমর (রা.)'র যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নি।

((আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানী, পৃ: ৮৫-৮৬) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৭২)

সেনাদল নিয়ে যাত্রা করলেও তখনও এ সিদ্ধান্ত হয় নি যে, তিনি নিজেই যাবেন নাকি কিছুদূর গিয়ে অন্য কাউকে সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করবেন। যাহোক, তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে (উল্লেখ) রয়েছে, হযরত উমর (রা.) লোকদের সাথে পরামর্শ করেন, সবাই তাঁকে ইরান যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তারা বলে, পুরো সেনাবাহিনীকে আপনার নেতৃত্বেই নিয়ে যান। সিরার পৌঁছার পূর্বে হযরত উমর (রা.) কারও সাথে পরামর্শ করেন নি। কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা তাকে সেখানে যেতে বাধা দেয়। অন্যেরা বলে, আপনি সেনাবাহিনী নিয়ে অবশ্যই যান, কিন্ত হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, না। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, ইতিপূর্বে আমি মহানবী (সা.) ছাড়া আর কারও জন্যই আমার পিতামাতাকে উৎসর্গ করি নি এবং তাঁর পরেও (আর কারও জন্য) এমনটি করব না, কিন্তু আজ আমি বলছি, হে সেই ব্যক্তি যাঁর জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত! এই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন। (একথা) তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন। এরপর তিনি হযরত উমর (রা.)-কে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আপনি সিরারেই অবস্থান করুন এবং এখান থেকে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিন। পুনরায় তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, প্রথম থেকে আপনি দেখেছেন যে, আপনার সেনাবাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত কী ছিল? আপনার বাহিনী যদি পরাজিত হয় তাহলে তা আপনার পরাজয়ের সমতুল্য হবে না। কিন্তু যদি আপনি প্রথমেই শহীদ হয়ে যান বা পরাজয় বরণ করেন তাহলে আমার আশংকা হল, মুসলমানরা এরপর আর কখনোই তাকবীর দিতে পারবে না কিংবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যও দিতে পারবে না। বিশিষ্ট এবং বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে পরমর্শ করার পর হযরত উমর (রা.) একটি সাধারণ সভা করেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা)'র এ পরামর্শ পাওয়ার পর তিনি (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং এরপর একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন, যেখানে বক্তৃতায় হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ইসলাম ধর্মে একত্রিত করেছেন আর তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলাম ধর্মে সবাইকে ভাই-ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের পারস্পরিক অবস্থা হল, এক দেহের ন্যায়। এর এক অংশের কষ্ট হলে অন্য অংশও সেটি অনুভব না করে থাকতে পারে না। অতএব, মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হল, তাদের বিষয়াদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, বিশেষত তাদের মধ্য থেকে জ্ঞানীদের পরামর্শ যেন গ্রহণ করা হয়। আর মানুষের জন্য আবশ্যক হল, যে বিষয়ে সবাই একমত ও সন্তুষ্ট হয় তার অনুসরণ ও আনুগত্য করা। আমীরের জন্য আবশ্যক হল, তিনি যেন মানুষের মধ্য থেকে বিজ্ঞপ্রাজ্ঞদের পরামর্শকে স্বীকৃতি দেন, অর্থাৎ জনগণ সম্পর্কে তাদের অভিমত এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনাকে (যেন স্বীকৃতি দেন)। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে লোকসকল! আমি এক সেনা হিসেবে তোমাদের সাথে যেতে চেয়েছিলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের পরামর্শদাতারা আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছে। তাই এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আর যাব না, বরং অন্য কাউকে প্রেরণ করব।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৮১) (তারিখে ইসলাম বি আহদে হযরত

উমর (রা.), নিবন্ধকার: সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ৩৫-৩৭)

তখন হযরত উমর (রা.) কারও সন্ধানে ছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর কাছে হযরত সা'দ (রা.)'র পত্র আসে। হযরত সা'দ (রা.) তখন নাজদ্ -এর সদকা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য (কর্মকর্তা হিসেবে) দায়িত্ব পালন করছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকে কারও নাম বল যাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা যায়। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি তো আপনি পেয়েই গেছেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কে? হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, বেলাভূমির বাঘ সা'দ বিন মালেক, অর্থাৎ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস(রা.)। অন্যরাও এই পরামর্শের সমর্থন করে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৮২)

তাবারীর ইতিহাসে (উল্লেখ) রয়েছে, হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করে নসীহত করেন, হে সা'দ! তুমি এটি ভেবো না যে, তোমাকে মহানবী (সা.)-এর মামা এবং সাহাবী বলা হয়। আল্লাহ্ তা'লা মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না, বরং মন্দকে পুণ্য দ্বারা প্রতিহত করেন। আল্লাহ্ তা'লা এবং বান্দার মাঝে আনুগত্য ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এই নসীহত করেন। যাত্রাকালে হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, আমার নসীহতকে স্মরণ রাখবে। তুমি এক কঠিন এবং গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছ, অতএব নিজ সত্তা এবং নিজ সাথীদের মাঝে পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টি কর এবং এর মাধ্যমে বিজয় যাচনা কর। আর স্মরণ রেখ! সকল অভ্যাস সৃষ্টির জন্যই একটি মাধ্যম থাকে। আর পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টির মাধ্যম হল, ধৈর্য। ধৈর্য ধারণ করলে পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টি হবে। অতএব,তোমাদের ওপর আপতিত সকল বিপদ এবং কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে। এর মাধ্যমে তোমাদের আল্লাহ্ তা'লার ভীতি অর্জিত হবে।

(তারিখে তাবারী, (উর্দু অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ২৫৩-২৫৪)

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, নিজ সঙ্গী মুসলমানদের নিয়ে শারাফ থেকে ইরান অভিমুখে অগ্রসর হও। শারাফ হল, নাজাদে একটি ঝর্ণা। তিনি বলেন, সেখানে সেনাবাহিনী একত্রিত হয়েছে, সেখান থেকে (অগ্রযাত্রা) আরম্ভ কর। আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা কর আর নিজের সমস্ত বিষয়ে তাঁর কাছেই সাহায্য চাও এবং স্মরণ রেখ, তুমি সেই জাতির মোকাবিলার জন্য যাচ্ছ যাদের সংখ্যা অনেক বেশি, সাজসরঞ্জাম অনেক বেশি, যুদ্ধশক্তি একান্ত সুদৃঢ়। আর এমন অঞ্চলের মোকাবিলার জন্য যাচ্ছ যা লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কঠিন এবং সুরক্ষিত, যদিও উর্বরতা এবং সতেজতার কারণে উত্তম এলাকা। আর লক্ষ্য রেখ! তাদের প্রতারণার শিকার হয়ো না যেন, কেননা তারা চতুর এবং প্রতারক লোক। আর তুমি যখন কাদসিয়া পৌঁছবে তখন তোমরা পাহাড়ী অঞ্চলের শেষপ্রান্ত এবং সমতল ভূমির প্রারম্ভিক প্রান্তে থাকবে। অতএব, তোমরা সে স্থলেই অবস্থান করবে এবং সেখান থেকে সরবে না। অর্থাৎ জায়গাও বলে দেন যে, সেখানেই থাকবে। শত্রুরা যখন তোমাদের আগমন সংবাদ পাবে তখন তারা ক্রোধান্বিত হয়ে নিজেদের সকল পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পূর্ণ শক্তিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি শত্রুদের সামনে পূর্ণ অবিচলতার সাথে দণ্ডায়মান থাক এবং শত্রুর সাথে লড়াইয়ে তোমাদের পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা থাকে আর তোমাদের সংকল্প সঠিক থাকে তাহলে আমি আশা করি, তোমরা তাদের ওপর বিজয় লাভ করবে।আর এরপর তারা কখনও এভাবে একত্রিত হয়ে তোমাদের মোকাবিলা করতে পারবে না; আর যদি করেও তবে তাদের মন সায় দিবে না অর্থাৎ ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে তারা মোকাবিলাবা যুদ্ধ করবে। আর যদি ভিন্ন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, অর্থাৎ যদি পিছু হটার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বা পরাজয়মূলক পরিস্থিতি দেখা হয়; তাহলে তোমরা ইরানী অঞ্চলের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে নিজেদের অঞ্চলের নিকটবর্তী পাহাড়ে চলে আসবে। এর ফলে নিজেদের অঞ্চলে তোমরা অধিক মনোবল পাবে আর সেই অঞ্চল সম্পর্কে তোমরা বেশি অবগত থাকবে। পক্ষান্তরে ইরানীরা তোমাদের অঞ্চলে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে এবং তারা সেই অঞ্চল সম্পর্কে অনবহিত থাকবে, এমনকি খোদা তা'লা পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের সুযোগ করে দিবেন। তিনি (রা.) নিশ্চিত ছিলেন, বিজয় তো হবেই; সাময়িকভাবে যদি এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েও যায়, তবুও চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। মোটকথা, এই বাহিনীর প্রতিটি গতিবিধি হযরত উমর (রা.)'র মদীনা থেকে প্রেরিত বিস্তারিত নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছিল। অতএব, তাবারী লিখেছেন,শারাফ থেকে সৈন্যবাহিনীর যাত্রার তারিখও হযরত উমর (রা.) নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং এই নির্দেশনাও প্রদান করেছিলেন যে, কাদসিয়া পৌঁছে সৈন্যবাহিনী যেন উযায়বুল হাজানাত ও উযায়বুল কওয়াদেস স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান নেয় এবং এই স্থানে যেন সৈন্যবাহিনীকে পূর্ব -পশ্চিম বরাবর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উযায়েব স্থানটিও কাদসিয়া ও মুগীসা'র মধ্যবর্তী একটি ঘাট, যা কাদসিয়া থেকে চার মাইল ও মুগীসা থেকে বত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র প্রতি প্রেরিত হযরত উমর (রা.)'র পত্র থেকে জানা যায় যে, সেখানে দু'টি উযায়েব ছিল; অর্থাৎ ইতিহাস থেকে এই বিষয়টিও জানা যায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৮৬-৩৮৭)(তারিখে ইসলাম বি আহদে হযরত উমর (রা.), নিবন্ধকার: সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ৩৫-৩৭)

হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে চার হাজার মুজাহিদ সঙ্গে দিয়ে ইরান অভিমুখে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ইয়েমেনের দু'হাজার ও না জাদের দু'হাজার সৈন্যও তাদের সাথে যুক্ত হয়; পথিমধ্যে বনু আসাদের তিন হাজার লোক ও আশআস বিন কায়েস কিন্দী নিজের অধীনে থাকা এক হাজার সাতশ' ইয়েমেনী সৈন্যসহ যোগ দেন। মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে, [আগে থেকে বিদ্যমান সৈন্যসহ] ত্রিশ হাজারের ওপরে গিয়ে পৌঁছে। এই বাহিনীর গুরুত্ব এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, এতে ৯৯জন এমন সাহাবী ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তাবারী তাদের সংখ্যা ৭০-এর অধিক বলে বর্ণনা করেছেন; ৩১০জনের অধিক এমন (যোদ্ধা) ছিলেন যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বয়আতে রিযওয়ান পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভের সম্মান লাভ করেছিলেন; ৩০০জন এমন সাহাবী ছিলেন যারা মক্কা-বিজয়ে অংশ নিয়েছিলেন; ৭০০জন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা স্বয়ং সাহাবী না হলেও সাহাবীদের সন্তান হওয়ার গৌরবের অধিকারী ছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবীওয়াক্কাস (রা.) শারাফ পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। মুসান্না (রা.) আট হাজার সেনা নিয়ে কূফার নিকটবর্তী একটি পানির ঘাট যু -কা'র নামক স্থানে মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন; এই অপেক্ষারত অবস্থাতেই তঁার মৃত্যু হয়। তিনি বশীর বিন খাসাসিয়াকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯-৩০২) (মুজামুল বালদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)

অর্থাৎ মুসান্না (রা.) সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত সা'দ (রা.) শারাফ পৌঁছে হযরত উমর (রা.)-কে সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন এবং পত্রে লিখে দেন যে, পুরো বাহিনীকে দশজন দশজন করে মুজাহিদ-দলে বিভক্ত করে প্রতি দলের জন্য একজন করে নেতা নিযুক্ত করে দাও এবং সেই দলগুলোর ওপর একজন বড় কর্মকর্তা নির্ধারণ করে দিও; এরপর তাদের সংখ্যা গণনা করে তাদেরকে কাদসিয়া অভিমুখে প্রেরণ কোরো। আর মুগীরা বিন শু'বার দলটিকে তোমার নেতৃত্বে রাখবে। অর্থাৎ হযরত উমর(রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, মুগীরা বিন শু'বার দলটিকে তোমার নিজের নেতৃত্বে রাখবে। এর পরবর্তী অবস্থার বিস্তারিত আমাকে লিখে পাঠাবে, আর এরপর প্রতিদিন যে অগ্রগতি হবে বা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে- তা আমাকে জানাতে থাকবে। হযরত সা'দ (রা.) এসব নির্দেশনা অনুসারে বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে বিস্তারিত অবস্থা লিখে জানান। প্রতি দশজনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা মহানবী (সা.)-এর যুগে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী-ই ছিল।

(তারিখুত তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১৫-১১৬)

অপর এক পত্রে হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে লিখেন, নিজ হৃদয়কে উপদেশ দিতে থাক এবং নিজের সৈন্যবাহিনীকেও উপদেশ দিতে থাক। ধৈর্য ধারণ কর; কেননা সংকল্প অনুযায়ী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়া যায়। যে দায়িত্বভার তোমার প্রতি অর্পিত হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তুমি পালন করতে যাচ্ছ তাতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন কর। অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন কর। খোদার কাছে নিরাপত্তা যাচনা কর এবং অধিকহারে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' পাঠ কর। আমাকে লিখে পাঠাও যে, তোমার সৈন্যবাহিনী কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তোমাদের মোকাবিলায় শত্রুপক্ষের সেনাপতি হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে? কেননা কিছু নির্দেশনা, যা আমি লিখতে চাচ্ছিলাম, তা শুধুমাত্র এজন্য লিখতে পারি নি, কারণ তোমাদের ও তোমাদের শত্রুপক্ষের কতিপয় অবস্থা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবহিত নই। সার্বিক অবস্থা লিখে পাঠাও, এরপর আমি তোমাদেরকে আরো দিক-নির্দেশনা প্রদান করব। অতএব, মুসলিম সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানস্থল সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত লিখে পাঠাও এবং সেই এলাকার অবস্থা, যা তোমাদের এবং

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

ইরানীদের রাজধানী মিদিয়ানের মধ্যে অবস্থিত, এমনভাবে লিখে পাঠাও যেন তা আমার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার ন্যায় চিত্র ফুটে ওঠে। অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ণ চিত্র লিখে পাঠাও এবং তোমাদের সার্বিক অবস্থা আমাকে বিস্তারিতভাবে অবগত কর আর খোদা তা'লাকে ভয় কর এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাশা রাখ আর নিজ কাজের ক্ষেত্রে তাঁর-ই প্রতি ভরসা কর এবং এ বিষয়টিকে ভয় করতে থাক যে, খোদা তা'লা তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জাতিকে এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়ে আসতে পারেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৮৭)(তারিখে ইসলাম বি আহদে হযরত উমর (রা.), নিবন্ধকার: সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ৫০-৫১)

অর্থাৎ সর্বদা তোমাদের উক্ত বিষয়ের ভয় থাকা উচিত। এমন নয় যে, তোমাদের ঠিকাদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি তোমরা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হও তবে খোদা তা'লা তোমাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়ে আসবেন আর এ কাজ অবশ্যই সম্পাদিত হবে।

কাদসিয়া পৌঁছে হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে তাঁর সেনাবাহিনীর অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে পাঠান। হযরত উমর (রা.) প্রত্যুত্তরে লিখেন, নিজ জায়গায় অবস্থান কর যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ আক্রমণের সূচনা করে। শত্রুপক্ষ যদি পরাজয় বরণ করে সেক্ষেত্রে মিদিয়ান পর্যন্ত অগ্রাভিযান পরিচালনা করবে। (তারিখুত তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১৭-১১৮)

হযরত সা'দ (রা.)'র বরাতে এ বিষয়ে (পূর্বেও) বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এখানে হযরত উমর (রা.)'র প্রেক্ষিতেও বর্ণনা করা প্রয়োজন যে, হযরত সা'দ (রা.) খিলাফতের নির্দেশনানুযায়ী কাদসিয়ায় এক মাস অবস্থান করেন; তথাপি ইরানীদের মধ্য হতে কেউ তাদের মোকাবিলা করার জন্য আসে নি। এতে উক্ত এলাকার লোকেরা ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাজারএর কাছে পত্র লিখে যে, আরবরা কিছুদিন যাবৎ কাদসিয়াতে অবস্থান করছে আর আপনারা তাদের মোকাবিলার জন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নি। তারা ফুরাত পর্যন্ত এলাকা ধ্বংসকরে দিয়েছে এবং গবাদি পশু ইত্যাদি লুটপাট করেছে। যদি সাহায্য না আসে তাহলে আমরা সবকিছু তাদের হাতে তুলে দিব। এই পত্র আসার পর ইয়াযদাজার রুস্তমকে ডেকে পাঠায় আর সে বিভিন্ন অজুহাতে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। আর তার স্থলে জালিনুসকে সেনাপতি নিযুক্ত করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বাদশাহ্ র সামনে তার কোন অজুহাতই ধোপে টিকে নি এবং সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে তাকে যেতে হয়।

হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে লিখেন, রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে তুমি এমন লোকদের প্রেরণ কর যারা সম্মানিত, বুদ্ধিমান এবং সাহসী। অর্থাৎ বিনাকারণে যুদ্ধ শুরু করলেই হবে না, বরং শত্রুপক্ষকেও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। তিনি (রা.) বলেন, এই তবলীগকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের লাঞ্ছনা এবং আমাদের জন্য সফলতার কারণ করবেন। তুমি প্রত্যহ আমাকে পত্র লিখতে থাকবে। এরপর হযরত সা'দ (রা.) ১৪জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে ইরানের বাদশাহ্ 'র দরবারে প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে প্রেরণ করেন যেন তারা ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাজারকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে। মুসলমানরা অশ্বরোহী ছিল। সেই মুসলমানদের ওপর চাদর ছিল এবং তাদের হাতে ছিল চাবুক। সর্বপ্রথম হযরত নো'মান বিন মুকাররিন বাদশাহ্ 'র সাথে কথা বলেন, অতঃপর মুগীরা বিন যারারা কথা বলেন।মুগীরা বাদশাহ্কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের সাথে হয় যুদ্ধ হবে নতুবা তোমাদেরকে কর প্রদান করতে হবে। এখন সিদ্ধান্ত তোমাদের হাতে- আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করবে, না হয় যু দ্ধের জন্য প্রস্তু ত হয়ে যাও। অবশ্য তৃতীয় আরেকটি পথ আছে, যদি তোমরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে নাও তাহলে এসব কিছু থেকে তোমরা নিজেদের নিরাপদ করবে। তখন ইয়াযদাজার বলে, যদি দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হত তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে হত্যা করতাম। আমার কাছ থেকে তোমরা কিছুই পাবে না। এখান থেকে ভাগো। এরপর সে মাটির একটি ঝুড়ি আনিয়ে বলে, আমার পক্ষ থেকে এটি নিয়ে যাও আর সে আদেশ দিয়ে বলল, এই দূতদেরকে শহরের দ্বার দিয়ে বের করে দাও। আসেম বিন আমর সেই মাটি গ্রহণ করেন এবং হযরত সা'দ (রা.)-কে সেটি দিয়ে বলেন, সুখবর! আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ দেশের চাবি প্রদান করেছেন। এ ঘটনার পর কয়েক মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষে নীরবতা বিরাজ করে। রুস্তম তার সেনাদল নিয়ে সাবাতে পড়ে থাকে। ইয়াযদাজার এরবারবার বলা সত্ত্বেও যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে থাকে। লোকেরা ইয়াযদাজারকে বলে যে, আমাদের সুরক্ষা করুন অন্যথায় আমরা আরববাসীদের অনুসারী হয়ে যাব। তখন বাধ্য হয়ে রুস্তমকে আক্রমনের জন্য অগ্রসর হতে হয় আর ইরানী সেনাবাহিনী সাবাত থেকে বেরিয়ে কাদসিয়ার প্রান্তরে তঁাবু খাটায়। রুস্তম যখন সাবাত থেকে বের হয় তখন তার সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং তার সাথে ছিল তেত্রিশটি হাতি। রুস্তম মিদিয়ান থেকে যাত্রা করে কাদসিয়া পৌঁছতে চার মাস সময় ব্যয় করে। রুস্তম কাদসিয়াতে শিবির স্থাপন করে পরবর্তী প্রভাতে মুসলিম সৈন্য সংখ্যার খবরাখবর সংগ্রহ করে আর মুসলমানদেরকে ফেরত যেতে বলে এবং সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেয়। রুস্তম মুসলমানদেরকে বলে, সন্ধি স্থাপন কর এবং ফেরত চলে যাও। এর প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা বলেন, আমরা জাগতিকতার আকাঙ্ক্ষায় এখানে আসি নি বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল, পরকাল। রুস্তম মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার দরবারে আলোচনার জন্য দূত প্রেরণ করার প্রস্তাব দেয়। রুস্তমের দরবারে উন্নতমানের মুল্যবান গালিচা বিছানো হয় আর পূর্ণ সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। রুস্তমের জন্য স্বর্ণের বিছানা পাতা হয় আর এর ওপর গালিচা বিছিয়ে এবং স্বর্ণের সুতা দিয়ে প্রস্তুত করা বালিশ বিছিয়ে খুব সুসজ্জিত করা হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হযরত রবী' বিন আমের গিয়ে উপস্থিত হন। রুস্তমের দিকে তাঁর অগ্রসর হওয়ার যে ভঙ্গি ছিল তা হল, নিজের বর্শার ওপর ভর দিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটছিলেন। বর্শার সূচাল অংশের আঘাতে গালিচার গদি ফেটেফেটে যাচ্ছিল আর এভাবে তিনি রুস্তমের কাছে পেঁ ছেন আর নিচে বসে নিজ বর্শা গালিচায় সোজা করে গেঁড়ে দেন। হযরত রবী' তিনটি প্রস্তাব রুস্তমের সম্মুখে উপস্থা পন করেন, প্রথমত আপনারা ইসলাম গ্রহণকরুন, আমরা আপনাদের পিছু ধাওয়া পরিত্যাগ করব আর আপনাদের দেশ নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা থাকবে না। নিজ দেশ আপনারাই শাসন করুন। (দ্বিতীয়ত) আমাদেরকে কর দিন তাহলে আমরা আপনাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করব। এ উভয় প্রস্তাবে যদি সম্মত না হন তাহলে আজ থেকে ঠিক চতুর্থ দিন গিয়ে আপনাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে। এই তিন দিন আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হবে না- তবে শর্ত হল, চতুর্থ দিন যুদ্ধ হলে তো হবে কিন্তু এই তিন দিন আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হবে না তবে আপনারা যদি যুদ্ধ শুরু করে দেন তাহলে আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হব। পরবর্তী দিন হযরত সা'দ (রা.) হযরত হুযায়ফা বিন মেহসনকে প্রেরণ করেন। তিনিও হযরত রবী'-এর ন্যায় উক্ত তিন প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করেন।তৃতীয় দিন হযরত মু গীরা বিন শো'বা যান আর তিনিও নিজ কথোপকথনের শেষে নিজ পূর্বোক্ত দুই সাথীর ন্যায় বলেন, ইসলাম গ্রহণ অথবা কর প্রদান করুন নতুবা যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বলেন। তখন প্রত্যুত্তরে রুস্তম বলে, তোমরা অবশ্যই মরবে! তখন হযরত মুগীরা বলেন, আমাদের মাঝে যে নিহত হবে সে জান্নাতে যাবে আর তোমাদের মাঝে যে নিহত হবে সে জাহান্নামে যাবে আর আমাদের মাঝ থেকে যে জীবিত থাকবে সে তোমাদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করবে। হযরত মুগীরার কথা শুনে রুস্তম চরম ক্রোধান্বিত হয়ে কসম খেয়ে বলে সূর্যের শপথ! আগামীকাল পূর্ণ সূর্য উদীত হবার পূর্বে ই আমরা তোমাদের সবাইকে তরবারি দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করব।

হযরত মুগীরার পরও কয়েকজন বিচক্ষণ মুসলমানকে হযরত সা'দ (রা.) রুস্তমের দরবারে প্রেরণ করেন যারা সন্ধ্যার সময় প্রত্যাবর্তন করেন।হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদের সারিবদ্ধ থাকার আদেশ দেন এবং ইরানীদের সংবাদ প্রেরণ করেন যে, নদী পার হওয়া তোমাদের কাজ। যেহেতু সেতুর ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণছিল তাই ইরানীদেরকে অন্য স্থানে আতিক নদীর ওপর সেতু বানাতে হয়। রুস্তম সেতু পারকরার সময় বলে, আগামীকাল আমরা মুসলমানদেরকে পদপিষ্ট করব। এক ব্যক্তি বলল, যদি আল্লাহ্ চান তবেই। তার সঙ্গীদের মাঝে কোন একজন একথা বলে, হয়তো আল্লাহ্র প্রতি তার বিশ্বাস ছিল। এতে রুস্তম বলে, আল্লাহ্ যদি না-ও চায় তবুও আমরা তাদেরকে পিষে ফেলব, নাউযুবিল্লাহ্। মুসলমানরা ইতোঃমধ্যে তাদের সেনা বিন্যাস সম্পন্ন করেছিল। আর হযরত সা'দ (রা.)'র শরীরে ফোঁড়া বের হয় ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি শায়াটিকা রোগের কারণে তিনি বসতেও পারছিলেন না। তিনি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতেন। তাঁর (রা.) বুকের নিচে বালিশ রাখা থাকতো যার ওপর ভর করে তিনি গাছের ওপরে বানানো মাচা থেকেসৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করতেন। হযরত সা'দ (রা.) খালেদ বিন আরফাতাকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিজয়ের কথা স্মরণ করান।

ইরানীবাহিনী আতিক নদীর তীরে অবস্থান করছিল। আতিক নদী ফুরাত নদী হতে সৃষ্ট একটি শাখা-নদী। মুসলমান সৈন্যরা কোদায়েস প্রাচীর এবং পরিখার পাশে অবস্থান করছিল। কোদায়েস হচ্ছে কাদসিয়ার পার্শ্ববর্তী একটি স্থান যেটি আতিক নদী থেকে প্রায় এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ইরানী সেনাদের মাঝে ৩০ হাজার সৈন্য শিকলাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ তারা একে অন্যের সাথে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল যাতে কেউ পলায়ন করার সুযোগ না পায়। হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদেরকে সূরা আনফাল পড়ার আদেশ দেন আর যখন তা পাঠ করা হচ্ছিল তখন মুসলমানরা নিজেদের মাঝে প্রশান্তি অনুভব করে। যোহর নামাযের পর মুসলমান এবং পারস্য সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়। তারা মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। বনু তামীম গোত্রের সুদক্ষ তিরন্দাজদের ডেকে হযরত আসেম (রা.) বলেন যে, নিজেদের তির দিয়ে হাতীর ওপর আরোহিতদের ওপর আঘাত হানো আর তিনি বীর সৈনিকদের

বলেন, হাতির পেছন দিক দিয়ে গিয়ে সেগুলের হাওদার বাঁধন কেটে ফেল। অতএব, এমন কোন হাতি অবশিষ্ট ছিল না যাদের ওপর সাজসরঞ্জাম ও আরোহী অক্ষত ছিল। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরও যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। প্রথমদিন বনু আসাদ গোত্রের পাঁচশ' মুসলমান শহীদ হয়েছিল। সেই দিনকে 'ইয়াওমে আরমাস' বলা হয়। পরবর্তীদিন প্রভাতে হযরত সা'দ (রা.) সমস্ত শহীদদের দাফন করেন এবং আহতদেরকে মহিলাদের হাতে তুলে দেন যাতে তারা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন। তখনই মুসলমানরা সিরিয়া থেকে আগত সাহায্যকারী সেনাদল পেয়ে যায়।

হযরত হাশেম বিন উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) সেই সাহায্যকারী সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন। এর অপর অংশে হযরত কাকা বিন আমর আমীর ছিলেন। হযরত কাকা অতি দ্রুত সফর শেষ করে আগওয়াসের প্রভাতে ইরাকের সৈন্যদের সাথে যোগ দেন। হযরত কাকা এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, তার সম্মুখ বাহিনীকে দশ জনের দলে বিভক্ত করেন যারা পরস্পর হতে কিছুটা দূরে-দূরে টহল দিচ্ছিল আর পালাক্রমে মুসলমান সৈন্যদের সাথে দশজনের দল মিলিত হতো। প্রত্যেক দলের আগমনে নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করা হত আর এমন মনে হচ্ছিল যে, মুসলমান সৈন্যদের ক্রমাগতভাবে সাহায্যকারী সৈন্যদল লাভ হচ্ছে। হযরত কাকা স্বয়ং প্রথম অংশে ছিলেন, সেখানে পৌঁ ছেই মুসলমানদের সালাম দেন এবং সৈন্যদলের আগমনের সুসংবাদ শোনান এবং ব লেন, হে লোকেরা! আমি যা করছি তোমরাও তাই কর। একথা বলে তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিকে ডাক দেন। এটি শুনে বাহমান জাযবিয়া মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হয়। দু'জনের মাঝে যুদ্ধ হয় এবং হযরত কাকা তাকে হত্যা করেন। মুসলমানরা বাহমান জাযবিয়ার মৃত্যুতে এবং মুসলমানদের সাহায্যকারী সৈন্যদলের কারণে অনেক আনন্দিত ছিল। হযরত কাকা সম্বন্ধে হযরত আবু বকর (রা.)'র একটি উক্তি হচ্ছে, সেই সেনাদল অপরাজেয় হয়ে থাকে যেখানে তার মত লোক থাকে।

সেই দিন ইরানী সেনাবাহিনী নিজেদের হাতির মাধ্যমে যুদ্ধ করতে পারে নি কেননা, সেগুলোর 'হাওদা' (তথা পিঠে নির্মিত তাঁবু) পূর্বের দিন ভেঙ্গে গিয়েছিল।তাই সকাল থেকেই তারা এটি ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। মুসলমানরা অন্য একটি কৌশলও অবলম্বন করে। তারা নিজেদের উটগুলোকে ঝুলন্ত কাপড় পরিয়ে দেয়, যার কারণে উট পর্দাবৃত হয়ে যায়। উটের ওপর কাপড় দে দেওয়া হয় যার ফলে উটের দেহ এবং গলা সম্পূর্ণ পর্দাবৃত হয়ে যায়। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এগুলো হাতি। এই উট যেদিকেই যেতো সেদিকেই ইরানীদের ঘোড়া এমন ভাবে ভয়ে পালাতে আরম্ভ করতো যেভাবে আগের দিন মুসলমানদের ঘোড়া ভয় পাচ্ছিল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দু'দলের অশ্বারোহীদের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আর মধ্যাহ্নের একটু পর থেকে রীতিমত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় যা মধ্যরাত পর্যন্ত চলতে থাকে। দ্বিতীয় এই দিনকে 'ইওয়ামে আগওয়াস' বলা হয়। এই দিন মুসলমানরা যুদ্ধে সফল হয়েছিল। তৃতীয় দিন সকালে উভয় সৈন্যদলই তাদের নিজেদের বুহ্যে অবস্থান করছিল। সেদিনও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মুসলমানদের মোট ২০০০ সৈন্য শাহাদত বরণ করে। অন্যদিকে ইরানী সেনাদলের দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। মুসলমানরা তাদের শহীদদের সাথে সাথে সমাহিত করছিল। আর আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য মহিলাদের কাছে হস্তান্তর করছিল। অন্যদিকে ইরানী নিহতদের লাশ সেভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে পড়েছিল। সেই রাতে ইরানীরা তাদের হাতির 'হাওদা' ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। পদাতিক সৈন্যরা তাদের হাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাতির সাথে ছিল। তাই সেসব হাতি সেদিন ততটা ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করতে পারে নি যতটা তারা আগের দিন করেছিল। হযরত সা'দ (রা.), হযরত কাকা এবং হযরত আসেমকে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, ইরানীদের সাদা হাতির হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। অতএব, হযরত কাকা এবং হযরত আসেম আক্রমণ করে হাতির দুটি চোখেই বর্শা ঢুকিয়ে দেন। ফলে চেতনা হারিয়ে সেই হাতি নিজের আরোহীকে নিচে ফেলে দেয়। হ াতির শুঁড় কেটে দেয়া হয়। এরপর তীর দ্বারা আক্রমণের মাধ্যমে হাতিকে ভূপতিত হতে বাধ্য করা হয়। এরপর অন্য মুসলমানরা অপর একটি হাতির চোখে বর্শা ঢুকিয়ে দেয়। এতে কখনও সেটি ছুটে মুসলমান বাহিনীর দিকে আসত তখন তারা তাকে বল্লম বিদ্ধ করতো। আবার যখন ইরানী বাহিনীর মাঝে যেতো তখন তারা বর্শা বিদ্ধ করতো। অবশেষে আজরাব নামক সেই হাতি আতিক নদীর দিকে দৌড়াতে শুরু করে, আর এর দেখাদেখি অন্যান্য হাতিরাও সেই হাতির পিছনে পিছনে নদীতে ঝাঁপ দেয়; আর আরোহীসহ সেগুলো মারা যায়। দিনের তৃতীয় প্রহর অবধি এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই দিনকে 'ইওমে আমাস' বলা হয়।

এশার নামাযের পর পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। বলা হয় তখন তরবারির শব্দ এমনভাবে শোনা যাচ্ছিল যেমন কামারের দোকানে লোহা কাটার শব্দ হয়। পুরো রাত হযরত সা'দ (রা.) জাগ্রত থাকেন আর আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়ারত থাকেন। আরব ও অনারবরা সেই রাতের মত ঘটনা কখনও প্রত্যক্ষ করে নি। সকাল হওয়ার পরেও মুসলমানদের উৎসাহউদ্দীপনা অবিচল ছিল এবং তারা জয়লাভ করে। সেই রাতের পরদিন সকালে সবাই অনেক ক্লান্ত ছিল। কেননা পুরো রাত তারা জেগে কাটিয়েছিল। সেই রাতকে 'লাইলাতুল হারীর' বলা হয়। এই নামকরণের কারণ হিসেবে লিখা হয়েছে যে, সেই রাতে মুসলমানরা নিজেদের মাঝে কথা বলে নি বরং শুধুমাত্র কানাঘুসো করেছে। 'হারীর' শব্দের অর্থের উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখা আছে, তীর নিক্ষেপের সময় ধনুক থেকে মৃদু শব্দ বের হয় অথবা যাঁতা চালানোর সময় যে মৃদু শব্দ হয় (তা হল হারীর)। তাবারীতেও লাইলাতুল হারীর নামকরণের কারণ হিসেবে এটি লিখা আছে যে, মুসলমানরা সেই রাতে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। তারা উচ্চস্বরে কথা বলছিল না বরং তারা ক্ষীণস্বরে কথা বলছিল। এই কারণে সেই রাত লাইলাতুল হারীর নামে প্রসিদ্ধি পায়। যাহোক, চতুর্থদিন সকালে পুনরায় দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ইরানীরা ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে। এরপর রুস্তমের ওপর আক্রমণ করা হয়। সে আতীক নদীর দিকে পালিয়ে যায়। যখন সে নদীতে ঝাঁপ দেয়, হেলাল নামে একজন মুসলমান তাকে ধরে ফেলে এবং টেনে হিঁচড়ে তীরে নিয়ে এসে হত্যা করে। এরপর রুস্তমকে যে মুসলমান হত্যা করেছিল সে ঘোষণা করতে থাকে যে, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি। আমার দিকে আস। মুসলমানরা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং উচ্চস্বরে নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করে। রুস্ত মের নিহত হবার সংবাদ শুনে ইরানীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যাও করে এবং বড় সংখ্যককে কারাবন্দীও করে। এ দিনটিকে ইয়াওমে কাদসিয়াহ্ বলা হয়। হযরত উমর (রা.) প্রতিদিন সকাল হতেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে আগত আরোহীদের কাদসিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। যুদ্ধের সুসংবাদ বাহক দূ ত যখন বলে, আল্লাহ তা'লা মুশরিকদের পরাজিত করেছেন তখন হযরত উমর (রা.) দৌড়াচ্ছিলেন আর তথ্য নিচ্ছিলেন আর সেই বার্তাবাহক নিজ উটনিতে আরোহিত ছিল আর সে হযরত উমর (রা.)-কে চিনতোও না। অবশেষে সেই দূত যখন মদীনায় প্রবেশ করে এবং মানুষ হযরত উমর (রা.) -কে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করছিল আর সালাম দিচ্ছিল তখন বার্তাবাহক হযরত উমর (রা.)-কে নিবেদন করেন, আপনি আমাকে বলেন নি কেন যে, আপনিই আমীরুল মু'মিনীন। হযরতউমর (রা.) বলেন, হে আমার ভাই, কোন ব্যাপার না।

যাহোক, বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর হযরত উমর (রা.) জনসমাবেশে বিজয়ের সংবাদ পাঠ করে শোনান অতঃপর এক প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা করেন। তিনি নির্দেশনা দিয়ে পাঠান যে, সৈন্যবাহীনি যেন নিজ জায়গায় অবস্থান করে এবং সেনাবাহিনীকে যেন পুনঃবিন্যাস ও পুনর্গঠন করা হয় এছাড়া সংশোধনযোগ্য অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও যেন মনোযোগ দেয়া হয়। হযরত সা'দ (রা.) খলীফার নিকট হতে কিছু দিকনির্দেশনা নিয়েছিলেন। যেমন, কাদসিয়ার যুদ্ধে ইরানীদের পক্ষ থেকে এমন অনেকে ছিল যারা ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করেছিল। তাদের অনেকেই আবার এ দাবীও করছিল যে, ইরানী সরকার তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদেরকে নিজেদের দলে যুক্ত করে নিয়েছিল অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় আসে নি বরং বাধ্য হয়ে এসেছিল আর এক্ষেত্রে অনেকের দাবী সঠিকও ছিল। অনেক লোক আবার যুদ্ধের কারণে এলাকা ছেড়ে শত্রুপক্ষের এলাকায় চলে গিয়েছিল এবং ফিরে আসছিল। হযরত উমর (রা.) এসব বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য মদীনায় মজলিসে শূরা আয়োজন করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এই নির্দেশনা দিয়ে পাঠান যে, যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল আর তারা চুক্তি বজায় রেখে নিজ এলাকাতেই অবস্থান করেছে, শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দেয় নি- তাদের সাথে কৃত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল না কিন্তু নিজ এলাকায় অবস্থান করেছে, শত্রুপক্ষে গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে সারিতে যোগ দেয় নি তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ব্যবহারই করা হবে যে ব্যবহার চুক্তিবদ্ধদের সাথে করা হচ্ছে। যারা দাবী করে যে, ইরানী সরকার তাদেরকে জোরপূর্বক নিজ সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে আর তাদের দাবী যদি সত্য প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে তাদের সাথেও মুসলমানদের সদাচরণে কোন কার্পণ্য করা হবে না। তাদেরকেও যেন কিছু বলা না হয়। তবে যারা এই দাবীতে মিথ্যাবাদী যে, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে বরং যদি স্বেচ্ছায় শত্রুর সাথে মিলিত হয়েতোমাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের পূর্বের চুক্তি রহিত হয়ে গেছে কেননা, তারা শত্রু পক্ষের সঙ্গ দিয়েছে। তাদের বিষয়ে নির্দেশনা হল, হয় তাদের সাথে পুনরায় সন্ধিচুক্তি হবে নতুবা তাদেরকে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁ ছে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাদের সাথে পুনরায় চুক্তি করে সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে, বসবাসের জন্য তারা যেখানে যেতে চায় চলে যাবে। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই আর তারা এই এলাকা ছেড়ে শত্রুর এলাকায় চলে গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে তোমরা যদি সমীচীন মনে কর তাহলে তাদেরকেও ডেকে নাও, তারা

যেন কর প্রদান করে। যতদূর সম্ভব নম্র আচরণ করতে হবে এবং তারা তোমাদের এলাকায় থাকবে। আর যদি তোমরা সমীচীন মনে কর যে, তোমরা তাদের ডাকবে না আর তারা পূর্বের ন্যায় তোমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখ। অর্থাৎ এরপরও যদি তারা সেখানে থাকে এবং যুদ্ধ করতে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে তোমাদেরও যুদ্ধ করার অধিকার আছে কিন্তু শত্রুর সাথে হাত মিলানো সত্ত্বেও তারা যদি বিরত হয় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দিবে।

এসব নির্দেশনা অনেক কার্যকরী প্রমাণিত হয় এবং আশপাশের লোকেরা ফিরে এসে নিজ নিজ জমিতে বসতি ও চাষাবাদ শুরু করে। আর (এটি) মহানুভবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কত বড় মহানুভবতা ছিল যে, মুসলমানরা তাদেরকেও নিজেদের জমি চাষাবাদের জন্য ফিরিয়ে আনে যারা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়ে নিজেদের সকল চুক্তি লঙ্ঘন করে শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছিল। যদিও মদীনার পরামর্শ সভা তাদেরকে এই বিষয়ের অনুমতি দিয়ে রেখেছিল যে, তোমরা চাইলে এমন ইরানীদের ফিরিয়ে আনতে পার অথবা নাও আনতে পার– সেক্ষেত্রে তাদের জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে সেসব জমি বণ্টন করে দিবে। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, এমন সংকটকালে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের ফিরিয়ে আনা হয় আর তাদের আবাদি জমির ওপর সাধারণ আবাদি জমির চেয়ে বেশি কর বা খাজনা ধার্য্য করা হয়েছিল। কেবলমাত্র এই একটি শর্তই আরোপ করা হয়েছিল যে, তোমরা চুক্তিভঙ্গ করেছ, (এখন) ফিরে আসো (এবং) নিজেদের ভূমি আবাদ কর, কিন্তু এই জমির কর বা খাজনা তোমাদেরকে অন্যদের চেয়ে বেশি দিতে হবে, কিন্তু তারপরও জমির মালিক তোমরাই থাক বে। ইরাকের বিভিন্ন বিজয়ের ক্ষেত্রে এ যুদ্ধটির আঘাত ছিল মোক্ষম। মুসলমান মুজাহিদরা অত্যন্ত অবিচলতা ও বীরত্বের সাথে চরম বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, খিলাফতের দরবার হতে যখন মানুষের জন্য ভাতা নির্ধারিত হয় তখন এক্ষেত্রে কাদসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকেও একটি বিশেষ মর্যাদার কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে । হযরত উমর (রা.) কাদসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অধিক ভাতা নির্ধারণ করেন।

(তারিখে ইসলাম বি আহদে হযরত উমর (রা.), নিবন্ধকার– সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির, পৃ: ৯১–৯৫) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩০১–৩৩৩) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৫–৪৩৬) (মুজামুল বালদান,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৪, ৩৫৬) (মুজামুল বালদান,১ম খণ্ড, পৃ: ৯৪, ২৬৭) (আল ফারুক, প্রণেতা– শিবলী নুমানী, পৃ: ৮৪–৮৯) (তারিখে তাবারী, (উর্দুতে অনুদিত), ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ২৬৩,৩১০,৩২৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদসিয়ার যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে যা বলেছেন তার মধ্য থেকে কিয়দাংশ বর্ণনা করছি।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন খসরু পারভেজ এর পৌত্র ইয়াযদাজার সিংহাসনে সমাসীন হয় আর ইরাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয় তখন হযরত উমর (রা.) তাদের মোকাবিলা করার জন্য হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) 'র নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। হযরত সা'দ (রা.) যুদ্ধের জন্য কাদসিয়ার প্রান্তরকে নির্বাচন করেন আর হযরত উমর (রা.)–কে উক্ত জায়গার মানচিত্র প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) এই স্থানটি খুবই পছন্দ করেন কিন্তু এর পাশাপাশি লিখেন, ইরানের সম্রাটের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে তোমার জন্য আবশ্যক হল, একটি প্রতিনিধি দল ইরানের সম্রাটের কাছে প্রেরণ করে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাও। অতএব, এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর তিনি ইয়াযদাজারের সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দল যখন পারস্য–সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয় তখন সম্রাট তার দোভাষীকে বলেন, এদেরকে জিজ্ঞেস কর, এরা কেন এসেছে? তারা আমাদের দেশে কেন নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। সে এই প্রশ্ন করলে প্রতিনিধি দলের নেতা হযরত নু'মান বিন মোকাররিন (রা.) দাঁড়ান এবং তিনি মহানবী (সা.) আবির্ভাবের উল্লেখ পূর্বক বলেন, তিনি (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন ইসলামের প্রচার–প্রসার করি আর বিশ্বের সকল মানুষকে সত্য ধর্মে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। এই নির্দেশ পালনার্থে আমরা আপনার সমীপেও উপস্থিত হয়েছি আর আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এই উত্তর শুনে ইয়াযদাজার চরম অসন্তুষ্ট হয় (আর) বলতে আরম্ভ করে, তোমরা এক বন্য ও মৃতখেকো জাতি। ক্ষুধা ও দারিদ্র তোমাদেরকে এই যুদ্ধে আসতে বাধ্য করে থাকলে আমি তোমাদেরকে এত পরিমাণ পানাহার সামগ্রী প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে নিজেদের জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে, এছাড়া তোমাদের পরিধানের জন্য পোশাকও প্রদান করবো। তোমরা এসব সামগ্রী নাও আর নিজেদের দেশে ফিরে যাও। আমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা কেন নিজেদের প্রাণ বিনষ্ট করতে চাচ্ছ? সে কথা শেষ করার পর ইসলামী প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে হযরত মুগীরাহ্ বিন যারারাহ্ (রা.) দাঁড়ান এবং তিনি বলেন, আপনি আমাদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা একেবারেই যথার্থ। আসলেই আমরা বন্য এবং মৃতখেকো জাতি ছিলাম। আমরা সাপ, বিছে, ফড়িং এবং টিকিটিকি পর্যন্ত খেয়ে ফেলতাম কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন আর তিনি আমাদের হিদায়াতের জন্য তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর কথার ওপর আমল করেছি যার ফলে এখন আমাদের মাঝে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমাদের মাঝে সেসব বদভ্যাস নেই যেগুলোর কথা উল্লেখ আপনি করেছেন। এখন আমরা কোন প্র লোভনেই প্রলুব্ধ হব না। আপনার সাথে আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে। অর্থাৎ আপনি যদি এটিই চান, আমাদের প্রস্তাবে যদি আপনি সম্মত না হন এবং আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চান, তবে তাই সই; আমরাও যুদ্ধ করব। জাগতিক ধনসম্পদের প্রলোভন আমাদেরকে আমাদের সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। ইয়াযদাজার একথা শুনে চরম ক্রোধান্বিত হয়ে তার এক ভৃত্যকে সামনে ডেকে আদেশ দেয়, যাও এক বস্তা মাটি নিয়ে আস। মাটির বস্তা এসে উপস্থিত হলে সে ইসলামী প্রতিনিধি দলের প্রধানকে সামনে আসতে বলে এবং বলে, তুমি যেহেতু আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ তাই এখন এই মাটির বস্তা ছাড়া তোমরা আর কিছুই পাবে না। (এ বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এখানে কিছুটা বিস্তারিত রয়েছে) সেই সাহাবী অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এগিয়ে গিয়ে নিজের মাথা নিচুঁ করে মাটির বস্তা পিঠে তুলে নেন। এরপর তিনি লাফ দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দরবারের বাইরে চলে আসেন এবং নিজের সঙ্গীদের উচ্চস্বরে বলেন, আজ পারস্য–সম্রাট নিজ হাতে আমাদেরকে তার দেশের মাটি তুলে দিয়েছেন। এই বলে তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়েন। বাদশাহ্ যখন তার এই কথা শোনে, সে কেঁপে ওঠে এবং নিজ দরবারের লোকদেরকে বলে, দৌড়ে গিয়ে তাদের কাছ থেকে মাটির বস্তা ফেরত নিয়ে আস। বাদশাহ্ বললো, এতো বড় অলক্ষুণে কাজহয়েছে! আমি নিজ হাতে এদেশের মাটি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি! তবে ততক্ষণে ইসলামীপ্রতিনিধি দল ঘোড়ায় চেপে বেশ দূরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাই হয়েছে যা তারাবলেছিল আর কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো পারস্য মুসলমানদের করতলগত হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এই মহান পরিবর্তন মুসলমানদের মাঝে সাধিত হওয়ার কারণ কী ছিল? এর কারণ হল, কুরআনের শিক্ষা তাদের স্ব ভাব–চরিত্রে এক বিপ্লব সাধন করেছিল। তাদের তুচ্ছ জীবনে তা এক মৃত্যু আনয়ন করেছিল আর তাদেরকে এক উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের উচ্চ মার্গে উপনীত করেছিল; এ কারণেই এ বিপ্লব সাধন হয়েছিল। অতএব, কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার মাধ্যমেই প্রকৃত বিপ্লব সাধিত হয়ে থাকে। ইনশাআল্লাহা তা'লা আগামীতেও এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে।

১ম পাতার শেষাংশ**********

থেকে বঞ্চিত থাকবে। এই আয়াতে একথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুফফারা মানুষের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য নিজেদের দস্তরখানাকে প্রশস্ত করত, সম্পদ উপার্জন করত এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর জয়লাভ করার জন্য গভীর পরিকল্পনা করত। অপরদিকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এই সব বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)ই জয়যুক্ত হবেন আর কুফফারদের মনে তাঁর সফলতা দেখে ঈর্ষা তৈরী হবে।

এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'লাও কানু মুসলেমুন' – কুফফাদের অস্থায়ী আবেগ এটি। নচেত তারা তো ভোগ বিলাস ও সম্পদ আরোহনে ব্যস্ত। আর অস্থায়ী আবেগ মানুষের কোন উপকারে আসে না, স্থায়ী আবেগই মানুষের উপকারে আসে। মুসলমানদের স্থায়ী আবেগ হল মুসলমান হওয়া, অস্থায়ীভাবে তারা খাদ্য গ্রহণ, সম্পদ আরোহণ এবং কিছু ভবিষ্যত পরিকল্পনাও করে থাকে। কাজেই এই সব কাজগুলি করেও তারা (মুসলমানেরা) হিদায়াত পাচ্ছে, কিন্তু কাফেররা হিদায়াত পায় না। (তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭)

সৈয়্যদানা হযরত আল মুসলেহ মওউদ খলীফাতুল মসীহ (রা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি হিদায়াত অন্বেষণকারী, আমার মতে, সে যেন যাবতীয় বিদ্বেষ ও ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে খোদার নিকট দোয়া করে যে, হে খোদা! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ , তুমি সকল সত্যের উৎস, তুমিই প্রকৃত পথপ্রদর্শক। অতএব, তুমি আমাকে সত্যের পথ দেখাও।' যদি কোন ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন করে, আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তার পথপ্রদর্শনের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করবেন। এটি এমন এক পন্থা যার দ্বারা ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে।" (আল ফযল, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৯)

আক্রমণ হতে থাকলে হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন যে, বার বার আক্রমণ কেন হচ্ছে। সেনাপতি উত্তর দেন আপনি আমাদের হাত বেঁধে রেখেছেন। এরপর কাদিসিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত হয় যা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ফলে হয়েছিল। এরপর মুসলমান সেনারা যখন ভিতরে প্রবেশ করল, সেখানেও কাউকে জোর করে মুসলমান করা হয় নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লা বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টজীবের অধিকার প্রদান কর, তবে তোমরা খোদার দৃষ্টিতে সম্মান লাভ করবে এবং তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। কুরআন করীম থেকে স্পষ্ট জানা যায়, যদি তোমরা মানুষের অধিকার প্রদান না কর, তবে যতই নামায পড়, সেই নামায তোমাদের জন্য ধ্বংসই ডেকে আনবে এবং তা তোমাদের মুখে নিক্ষিপ্ত হবে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ইবাদতের থেকে বেশি গুরুত্ব রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই জিনিষের জন্যই আমরা চেষ্টা করছি। বর্তমান যুগের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, সারা বিশ্বের সংশোধন এক দিনে করা সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা অব্যাহত রাখব আর এই কাজকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে থাকব, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবী এই সত্য উপলব্ধি না করে।

লিথোনিয়া প্রতিনিধি দলের আরেক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, একজন খৃষ্টান হিসেবে আমাকে মুসলমানদের মাঝে কিভাবে বসবাস করা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: খৃষ্টধর্মও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে, ইহুদীধর্ম, ইসলাম ধর্ম খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। সমস্ত ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব, প্রথমত আমাদেরকে খোদাকে চিনতে হবে এবং ধর্মের বুনিয়াদি শিক্ষাকে প্রণিধান করতে হবে এবং সেগুলি পালন করে চলতে হবে-সেই শিক্ষা বর্জন করতে হবে যা কিছু উলেমারা বিকৃত করে রেখেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: আহলে কিতাবদের বলে দাও, তোমরা এমন এক বিষয়ের উপর একত্রিত হও, যা তোমাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে সমান। আর সেটি হল খোদা তা'লা সত্তা। অতএব সেই সত্তার উপর ঈমান এনে তাঁর পথ-নির্দেশনা পালনের মাধ্যম আমাদের সকলকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এটিই সেই মূল শিক্ষা যার নির্দেশ অনুসারে আমরা পৃথিবীতে কাজ করছি। আল্লাহ্‌র কৃপায় সমস্ত ধর্মের অনুসারী এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক আছে।

প্রতিনিধি দলের এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন- হুযুর বিভিন্ন অমুসলিম দেশের সফর করেছেন, সে সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও অভিমত কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: অমুসলিম দেশেই তো আমি বসবাস করছি। আমি তো আর সিরিয়া, ইরাক বা সৌদি আরব থেকে আসি নি। এই কারণে এই অমুসলিম দেশগুলিতে অন্ততপক্ষে পরধর্ম সহিষ্ণুতা রয়েছে, আর আমার মতে যতদিন এটি অক্ষুন্ন থাকবে, এরা খোদার দৃষ্টিতেও শ্রেয় হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, এরা প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীকে খোলামেলা ভাবে নিজেদের ধর্মাচার ও প্রচারের অনুমতি দেয়। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে যে সহনশীলতার নির্দেশ দিয়েছিলেন, স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) যেটি অনুশীলন করেছিলেন, আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলিতে সেই জিনিসটিরই অভাব প্রকট। অতএব, যাদের মধ্যে এই সহনশীলতা এবং মানবীয় মূল্যবোধ জীবিত থাকবে তারাই শ্রেয় হিসেবে গণ্য হবে।

লাতিভিয়ার প্রতিনিধি দলের এক সদস্যা প্রশ্ন করেন, পুরুষ ও মহিলা কেন পরস্পর করমর্দন করতে পারে না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব শিক্ষা রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা অনুসারে পর পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলা করমর্দন করতে পারে না। এই আদেশ এই জন্য দেওয়া হয় নি যে, মহিলাদের মর্যাদা নীচে, বরং কিছু আশঙ্কা রয়েছে, আর মহিলাদের সম্মান বজায় রাখার জন্য ইসলাম এবিষয়টি থেকে বিরত রেখেছে। আর করমর্দন না করার শিক্ষা ইহুদী মহিলাদের জন্যও রয়েছে। পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই করমর্দন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের মসজিদের পাশেই ইহুদীদেরও একটি সীনাগগ রয়েছে। সেখানে ইহুদীরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানকার রাবাই (ইহুদী ধর্মগুরু) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, আমার সঙ্গে কোন মহিলা করমর্দন করতে চাইলে আমি করব না। কেননা, আমার ধর্ম এর অনুমতি দেয় না। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলে না, কেননা, ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলা আইনত অপরাধ বলে গণ্য হয়। একবার এক ইহুদী মহিলা নিজে আমাকে সাক্ষাতকালে বলেছে, তাদের ধর্মেও পুরুষদেরকে সালাম করা অর্থাৎ করমর্দন করা বৈধ নয়। এই কারণে কেবল করমর্দনের বিষয়টি নিয়ে এত তোলপাড় করার প্রয়োজন কিসের? আরও তো অনেক সৌন্দর্য রয়েছে, সেগুলির উপর কেন দৃষ্টি দেওয়া হয় না? যতদূর মহিলাদের সম্মানের বিষয় বা এমন কোন মহিলার প্রসঙ্গ আসে, তবে তখন আমি নিজের সম্পর্কে বা জামাত সম্পর্কে বলতে পারি, সবার আগে আমরাই এমন মহিলার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসব, তাকে সে স্থান থেকে তুলে নিয়ে যেতে হলেও। আর এটিই মহিলাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন যা আমাদের করা উচিত। কেবল হাত মেলালেই মহিলাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত থাকে না। বিষয়টি এখন গোটা বিশ্ব বুঝতে পারছে। হলিউডের ঘটনার পর পুরুষদের উপর কতগুলি অভিযোগ উঠেছে? এখানে জার্মানির বার্লিনে মহিলারা নিজেদের পৃথক অফিস বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। তারা বলছে, পুরুষরা অসভ্যতা করে, সেই কারণে আমরা নিজেদের পৃথক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছি। এই কারণেই ইসলাম যে শিক্ষামালা নিয়ে এসেছে তা (পাপের) তুচ্ছাতিতুচ্ছ সম্ভাবনা থেকেও মানুষকে রক্ষা করে। আমরা এইসব কাজ মহিলাদের সম্মান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাদেরকে অসম্মান করতে নয়।

সিরিয়ান বংশোদ্ভূত এক অতিথি ব্যক্তি যিনি স্লোভেনিয়ায় থাকেন, তিনি বলেন- জলসার ব্যবস্থাপনার অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। আমি অনেক নতুন নুতন জিনিস শেখার সুযোগ পেয়েছি যা নিজের জীবনের অংশ করে তোলার চেষ্টা করব আর কখনো তা ভুলব না।

রেড ক্রাস সোসাইটিতে কর্মরত এক উকিল মি. গ্রেগর স্যাকোভিক আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মঞ্চের পিছনে ব্যানারেও লেখা ছিল-

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

কুরআন করীম আল্লাহ্, রসূল এবং শাসকদের আনুগত্য করার আদেশ দেয়। 'উলিল আমার' -এর যতদূর সম্পর্ক, যদি কোন প্রশাসক, কোন দেশ আপনার ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং আপনাকে ধর্মীয় শিক্ষামালা অনুশীলনে বাধা দেয় তবে সেক্ষেত্রে আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, পাকিস্তানে আমরা কলেমা পাঠ করি, আসসালামো আলাইকুম বলি এবং নামায পড়ি। এই বিষয়গুলিতে আমরা দেশের আইন মেনে চলি না। ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আইন আমরা মেনে চলব না। অন্যান্য যাবতীয় আইন শৃঙ্খলার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল আর প্রশাসকদেরকে আমরা সম্মানও দিয়ে থাকি। মহানবী (সা.)কেও একটি আইন তৈরী করে নামায পড়েতে বাধা দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি (সা.) সেটি স্বীকার করে নেন নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পাকিস্তানে আসসালামো আলাইকুম বললে তিন বছরের কারাদন্ড হতে পারে। কলেমা তৈয়্যবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মুদর রাসূলুল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসূল) উচ্চারণ করলে তিন বছরের কারাদন্ড হয়। অনেক আহমদী এই শাস্তি গ্রহণ করে জেলে গিয়েছেন। তারা শাস্তি গ্রহণ করেছেন কিন্তু নিজেদের ঈমান থেকে পশ্চাদপদ হন নি।

এক ক্যাথলিক ভদ্রমহিলা যিনি একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছেন, হুযুর আনোয়ার (আই.) তাকে বলেন: ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে পরস্পরের উপর কোন বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়। ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় বিষয়। যে শিশু জন্ম নিবে সে পিতার ধর্ম অবলম্বন করবে। পিতার মতই তার শিক্ষা-দীক্ষা হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার বয়স উপনীত হওয়ার সময় তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। মতভেদ তৈরী না করে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, উভয় ধর্মে যে সব উত্তম বৈশিষ্টাবলী রয়েছে সেগুলি গ্রহণ করে নেওয়া। স্বামীর দেখা উচিত যে, স্ত্রীর ধর্মের যদি উত্তম গুণাবলী থাকে তবে সেগুলি গ্রহণ করতে হবে আর অনুরূপটি স্ত্রীকেও করতে হবে। কিন্তু একে অপরের উপর জোর করতে পারবে না।

স্লোভেনিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)=এর সাক্ষাতের অনুষ্ঠান সওয়া এগারোটার সময় শেষ হয়। সাক্ষাত শেষে অতিথিবর্গ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ছবি তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(৮র্থ পর্ব)

প্রশ্ন: সরকারি ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করা এবং তা থেকে পাওয়া লভ্যাংশ গ্রহণ করার বিষয়ে নাযিম সাহেব দারুল ইফতা (রাবোয়া) -প্রশ্ন করলে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৭ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখের চিঠিতে বলেন-

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এর খিলাফতকালে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, আমার অবস্থানও সেই অনুসারে।

(বি:দ্রঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর খিলাফতকালে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) -এর খিলাফতকালে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া পাকিস্তান= এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশ হুযুরের সমীপে উপস্থাপন করা হয়।

'সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া ব্যাংকসমূহে সঞ্চিত অর্থে কোন রকম সুদগ্রহণ করছে না। আর পি.এফ এর অর্থও এমন সব ব্যাংকে জমা রাখছে না যাদের ব্যবসায়ের বা আয়ের মূল ভিত্তি সুদের উপর দাঁড়িয়ে। এর বিপরীতে সরকারের জাতীয় সঞ্চয় যোজনার অধীনে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের পুঁজি দেশের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করে (সুদের ব্যবসায় খাটায় না) । এর ফলে অর্থ ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং কর্মসংস্থানের বেশি সুযোগ তৈরী হয় যা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটায়। আর এর ফলে সরকারও সঞ্চয় কারীদেরকে নিজেদের লভ্যাংশের ভাগীদার করে নেয়, সরকার সেটিকে লাভ নামে আখ্যায়িত করে। সঞ্চয়কারীরা নিজেদের প্রয়োজন সেই অর্থ তুলেও নিতে পারে।

ব্যাংক এবং জাতীয় সঞ্চয় যোজনার এই পার্থক্যের কারণেই সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ.) এর অনুমতিক্রমে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানে পি.এফ-এর টাকা লাগানো হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর অনুমতিক্রমে বিলাল ফান্ড এবং যাকাতের ফান্ডের টাকা সঞ্চয় স্কীমের অধীনে জমা করা হয়েছে।

জামাতে আহমদীয়ার মুফতি (হযরত মালিক সাইফুর রহমান) =এর মতেও সরকারের সঞ্চয় স্কীমে অংশ নেওয়া যেতে পারে। যেমনটি তিনি বলেছেন-

'সরকার সঞ্চয়ের জন্য একটি স্কীম শুরু করেছে, কেউ চাইলে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর তা থেকে যে লাভ পাওয়া যায় তা ব্যবহার করতে পারে।

এছাড়া পাকিস্তানে বর্তমানে কোন বিকল্প ব্যবস্থা বা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে নিশ্চিন্তে পুঁজি বিনিয়োগ করা যেতে পারে, যেখানে পুঁজি নিরাপদ ও লাভজনক, কিম্বা লাভদায়ক না হলেও সময়ের সাথে সাথে মুদ্রার যে অবমূল্যয়ন ঘটে, অন্ততপক্ষে তার দ্বারা পুঁজি যেন প্রভাবিত না হয়। (অতএব, ব্যাংকে- যেখানে খোলাখুলি সুদের লেন দেন হয়, সেখানে অর্থ সঞ্চয় করার পরিবর্তে এই সব স্কীমে বিনিয়োগ করা হয়েছে, যেগুলিতে পুঁজি উন্নয়নমূলক অবকাঠামো নির্মাণের কাজে ব্যবহার করার কারণে সরকার সেগুলিকে সুদমুক্ত বলে আখ্যা দেয়। কিম্বা অন্ততপক্ষে ব্যাংকের তুলনায় নিশ্চিতভাবে সুদের ব্যবসা করে না)

আরও একটি সম্ভাব্য উপায় আছে। জামাত নিজের পুঁজি দ্বারা নিজেই এমন ব্যবসায়িক প্রকল্প তৈরী করতে পারে যা সন্দেহাতীতভাবে সুদমুক্ত হবে। কিন্তু বর্তমানকালে জামাত দেশের মধ্যে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা এভাবে পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষে মোটেই অনুকুল নয়।

কাজেই, জাতীয় সঞ্চয় স্কীমে পুঁজি বিনিয়োগ অনেকাংশে নিরুপায় হয়েই। এটি ছাড়া পুঁজি বিনিয়োগের অন্য কোন বিকল্প দেশে নেই।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া পাকিস্তান- এর এই সুপারিশগুলিকে ১৯৮৭ সালের, ১৩ আগস্ট তারিখে মঞ্জুর করে বলেন, 'বেশ, ঠিক আছে।'

প্রশ্ন: তফসীরে কবীরে দাসীদের বিষয়টি নিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যে অবস্থান নিয়েছেন তার উল্লেখ করে এক ভদ্রমহিলা বিষয়টির উপর আরও আলোচনা করার আবেদন করেছেন। এছাড়াও তিনি পাকিস্তানের লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র শিক্ষা বিষয়ক একটি র‍্যালি উপলক্ষ্যে প্রদর্শিত একটি তথ্যচিত্রে এক=দেড় মিনিট মিউজিক বাজার অভিযোগও করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন=

'দাসীদের সঙ্গে নিকাহর বিষয়ে আপনার অবস্থান তফসীরে কবীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর ব্যাখা অনুযায়ী একেবারে সঠিক। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালও (রা.)-এর এই একই অবস্থান ছিল। অর্থাৎ দাসীদের সঙ্গে নিকাহ করা আবশ্যক। কুরআন করীম এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর নির্দেশের আলোকে আমিও একথাই মনে করি যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে শত্রুরা যখন ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নানান প্রকারের যাতনা দিচ্ছিল, আর যদি কোন দরিদ্র ও অত্যাচারিত মুসলিম মহিলা তাদের হাতে আসত, তবে তারা তাকে দাসী হিসেবে নিজেদের স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিত। ..... কুরআন করীমের এই শিক্ষা অনুসারে যে সব মহিলারা ইসলামের উপর আক্রমণকারী সৈন্যদের সঙ্গে তাদের সাহায্যার্থে আসত, সেই যুগের প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধে তাদেরকে দাসী হিসেবে বন্দী করে নেওয়া হত। শত্রুপক্ষের এই মহিলারা যখন মুক্তিপণ অথবা চুক্তির মাধ্যমেও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না, তখন এমন মহিলাদের সঙ্গে নিকাহর পর সহবাস করা যেতে পারত। কিন্তু এই নিকাহর জন্য সেই মহিলার সম্মতির প্রয়োজন হত না। অনুরূপভাবে এমন দাসীদের সঙ্গে নিকাহ করার ফলে পুরুষদের চারটি বিয়ে করার অনুমতিতে কোন তারতম্য ঘটত না। অর্থাৎ একজন পুরুষ চারটি বিয়ের পরও উল্লেখিত দাসীদের সঙ্গে নিকাহ করতে পারত। কিন্তু যদি সেই দাসীদের কোন সন্তান জন্ম নিত, সেক্ষেত্রে সন্তানের মা হিসেবে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হত।

শত্রুবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মহিলারা যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে আসত আর সেই যুগের প্রথামত তারা মুসলমানদের হাতে দাসী হয়ে আসত, তখন তাদের সঙ্গে সহবাসের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন নিকাহর প্রয়োজন নেই= এমন দৃষ্টিভঙ্গিও ভুল নয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অন্যান্য কিছু স্থানে এমন দাসীদের বিষয়ে উত্তর দিতে গিয়ে এই মতও ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) ও মজলিসে ইরফানের কয়েকটি অনুষ্ঠানে এবং দরসুল কুরআনে দাসীদের বিষয়ে তফসীর করতে গিয়ে একই মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ এই সব দাসীদের সঙ্গে সহবাসের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন নিকাহর প্রয়োজন হয় না।

এখানে এ বিষয়টিও বর্ণনা করা সমীচীন বলে মনে করি যে, কুরআন করীমে বর্ণিত এমন সব অতীতের বিষয়াদির ব্যাখ্যা নিয়ে খলীফাগণের মাঝে মতানৈক্য হওয়াও আপত্তির বিষয় নয়, এগুলি প্রত্যেক খলীফার কুরআন সম্পর্কে বোধগম্যতার পরিচায়ক আর খলীফাদের মাঝে এমন মতবিরোধ বৈধ।

যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি যে, এ বিষয়ে আমার মত এটিই যে, শত্রুপক্ষের এমন মহিলাদের সঙ্গে সহবাসের জন্য নিকাহর প্রয়োজন হত আর আমার এই সময়কালে এটি জামাতের অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এটাও সম্ভব যে, আমার পরে আগমণকারী খলীফা আমার এই অবস্থানের বিপক্ষে মত দিতেও পারে। যদি এমনটি হয়, তবে সেই সময় সেটিই জামাতের অবস্থান হিবে বিবেচিত হবে যা সেই সময়ের খলীফার অবস্থান হবে।

এছাড়াও একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই যুগে কোথাও এমন কোন যুদ্ধ হচ্ছে না যা ইসলামকে ধ্বংস করতে করা হচ্ছে আর সেখানে মুসলমান মহিলাদের প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে, তাদেরকে দাসী বানানো হচ্ছে। এই কারণে এই যুগে মুসলমানদের জন্যও এমনটি করা অবৈধ এবং হারাম।

আপনি চিঠিতে আরও একটি অভিযোগের কথা লিখেছেন। লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র শিক্ষা বিষয়ক র‍্যালিতে একটি তথ্যচিত্রের শুরুতে এক=দেড় মিনিট মিউজিক যোগ করা হয়েছিল। যেমনটি আপনি নিজেই লিখেছেন, এটি তথ্যচিত্র ছিল, যা আমাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত নয়, ফিল্ম নির্মাতা এতে মিউজিক যুক্ত করেছিল, আমরা কিভাবে সেটি ফিল্ম থেকে বাদ দিতাম। তাই এতে কোন আপত্তির কিছু নেই। বস্তুত এটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি অনুসারে এটি দাজ্জালের এমন ধোঁয়া যা থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

যতদূর আমাদের তৈরী অনুষ্ঠানগুলি বা আমাদের এম.টি.এর প্রসঙ্গটি রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের অনুষ্ঠানমালা এবং এম.টি.এ =ও সম্পূর্ণরূপে মিউজিকমুক্ত, এগুলির মধ্যে এমন শরিয়ত পরিপন্থী বিষয় থাকে না। আর এটি সেই দৃষ্টান্ত যাকে সত্য ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ইসলামের এই নমুনাই এম.টি.এর যাবতীয় অনুষ্ঠানে সর্বত্র উপস্থাপিত হয়।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ৩১ শে অক্টোবর তারিখে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ইন্ডোনেশিয়ার জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্রদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতে সময় একটি ছাত্র প্রশ্ন করে যে, বর্তমান যুগে অনেকে যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিষয়ে বিদ্রুপ করে, তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে কি উত্তর দেওয়া উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন-

'প্রথম কথা হল, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে স্বয়ং বলেছেন, ' ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা'। অর্থাৎ যারা তোমাকে তাচ্ছিল্য করে, আমি তাদেরকে উপহাসের পাত্র বানিয়ে দিব- এই পৃথিবীতেই অপদস্ত হোক বা মৃত্যুর পর, কিম্বা তাদের সন্তানসন্ততিরা অপদস্ত হোক। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের শায়েস্তা করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিক্রিয়া

সেটিই যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ব্যক্ত করেছেন। তিনি উপদেশ দিয়েছেন,' তোমরা ধৈর্য ধর, কারোর কঠোর কথার উত্তর কঠোরভাবে দিবে না, তোমরা কারো সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ো না- আমার প্রতি তোমাদের প্রবল ভালবাসার কারণে কারোর সঙ্গে লড়াই করতে যেও না।' দেখ, আমরা সব থেকে বেশি আঁ হযরত (সা.)কেই ভালবাসি। তাই তো? আমাদের কাছে মসীহ মওউদ (আ.)-এর থেকেও বেশি প্রিয় হলেন হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)। কিন্তু আজকাল ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র তৈরী করে উপহাস করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিক্রিয়া কি? আমরা বলি ,এস আমরা রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি ব্যপক হারে দরুদ প্রেরণ করি। আর আমরা যখন রসুল করীম (সা.)-এর উপর দরুদ প্রেরণ করি তখন তাঁর বংশধরদের উপর প্রতিও দরুদ প্রেরণ করি। এর মধ্যে মহম্মদ (সা.)-এর পরিবারও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সব থেকে বড় বংশধর হলেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)। তিনিই সব থেকে বেশি তাঁর বংশধর হওয়ার অধিকার রাখেন। তাই লোকেরা যখন তাকে নিয়ে উপহাস করে, তখন আমাদের কাজ হল তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করা। এটি ছিল প্রথম কথা। রসুল করীম (সা.)-এর বিষয়ে উপহাস হোক বা তাঁর একনিষ্ঠ দাস মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর বিষয়ে- তাঁর (সা.) এর প্রতি দরুদ পাঠ করুন।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, নিজেদের নমুনা এমন তৈরী করুন যাতে বিদ্রুপকারীরা নিজে থেকেই নীরব হয়ে যায়। তারা যেন একথা চিন্তা করে যে, আমরা উপহাস করছি, কিন্তু এরা তো আমাদের কাছে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার বর্ণনা করছে, এরা ভালবাসার প্রসার করছে, আমরা তাদের কাছে হিংসা-বিদ্বেষের কথা বলি, আর এর আমাদের কাছে ভালবাসার কথা বলে। কুরআন শরীফেও একথাই লেখা আছে যে,'কাআন্নাহুম ওলীউন হামীম।' তোমাদের যদি আচরণ ভাল হয়, তবে তোমাদের শত্রুরা তোমাদের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বন্ধুতে পরিণত হবে। তাই আমাদের প্রতিক্রিয়া হল, আমরা নীরবে নিজেদের ব্যবহারিক সংশোধন করব, নিজেদেরকে আরও উন্নত করব, আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনীত হব এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করব যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের অবস্থার সংশোধন করেন আর আল্লাহ্র নিকট তাদের অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয় তবে তাদের থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন এবং তাদের মুখ বন্ধ করে দিন যাতে এরা আমাদের প্রিয় ব্যক্তিদের নিয়ে উপহাস না করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিম্বা আঁ হযরত (সা.)- কাউকে নিয়েই যেন তারা উপহাস না করে। আর আমরা যেন আনন্দ প্রত্যক্ষকারী হই। পৃথিবীতে আমরা যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি, তখন আমাদের আনন্দ হয়। তাই আমাদের দোয়া করা উচিত যে, এই সব মহাপুরুষদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি, যাতে আমরা আনন্দিত হই। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে হবে, নিজেরা লাঠি,ছুরি, বন্দুক বা কামান হাতে নিব না। আমরা কিছু করব না। আমরা শুধু আল্লাহ্র দরবারে বিনত হব, নিজেদের অবস্থার সংশোধন করব এবং বেশি করে দরুদ শরীফ পাঠ করব।

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, ব্যবসা বাণিজ্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য এবং দুর্ঘটনায় হওয়া ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে বীমাকরণ সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশ কি?

২০১৬ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে লেখা চিঠিতে হুযুর আনোয়ার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন-

একমাত্র সেই সব বীমা বৈধ যার থেকে পাওয়া অর্থে লাভ ও ক্ষতিতে অংশীদার হওয়ার শর্ত থাকে, জুয়োর রূপ থাকে না। কেবল যদি লাভের শর্তে অংশীদারী পাওয়া যায়, তবে তা সূদ হওয়ার কারণে অবৈধ।

অনুরূপভাবে যদি পলিসি হোল্ডার কোম্পানির সঙ্গে এমন চুক্তি করে নেয় যে, সে শুধুমাত্র সঞ্চিত অর্থ নিবে, সুদ নিবে না, তবে এমন বীমা করাতেও কোন অসুবিধা নেই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইনসিউরেন্স প্রসঙ্গে বলেছেন-সুদ এবং জুয়োকে পৃথক করে অন্যান্য চুক্তি এবং দায়িত্বকে শরিয়ত সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছে। জুয়োর মধ্যে দায়িত্ব থাকে না। জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্যে দায়িত্বের প্রয়োজন আছে। "

(বদর পত্রিকা, ১০নং, ২য় খণ্ড, পৃ:৭৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন- 'যদি কোন কোম্পানি শর্ত রাখে যে, বীমা গ্রহণকারী কোম্পানির লাভ ও ক্ষতি উভয়ের শরিক হবে, তবে বীমা করানো বৈধ হতে পারে।

(আল ফযল, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩০)

একটি চিঠির উত্তরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লেখেন, আমরা সুদের সংমিশ্রনের কারণে ইনসিওরেন্সকে অবৈধ বলি, এমন কথা সঠিক নয়। অন্তত আমি তো এটিকে এই কারণে অবৈধ বলি না। এর অবৈধ হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে, যার মধ্যে একটি হল, ইনসিওরেন্স ব্যবসার ভিত্তি টিকে আছে সুদের উপর। আর কোন ব্যবসার ভিত্তি সুদের উপর হওয়া এবং কোন বিষয়ে সুদের সংমিশ্রন হওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। সরকারের আইন অনুসারে কোনও ইনসিওরেন্স কোম্পানি দেশে চালু হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার এক লক্ষ (টাকার) সিকিউরিটি না কেনে। কাজেই এখানে সংমিশ্রনের প্রশ্ন নেই, আবশ্যিকতার প্রশ্ন।

২) দ্বিতীয়ত, ইনসিওরেন্সের নীতি হল সুদ। কেননা, ইসলামী শরিয়ত অনুসারে ইসলামের নীতি হল কেউ যখন কাউকে কোন অর্থ দেয় তা উপহার, আমানত, অংশ কিম্বা ঋণ হতে পারে। এটি উপহার অবশ্যই নয়, আমানতও নয়, কেননা আমানতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এটি অংশও নয়, কেননা কোম্পানীর লাভ লোকসানের দায়িত্ব এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে পলিসি হোল্ডার শরিক নয়। আমরা এটিকে ঋণ হিসেবেই গণ্য করব, আর বাস্তবেও তা ঋণই বটে। কেননা এই টাকাকে ইনসিওরেন্স কোম্পানি নিজেদের ইচ্ছে ও অধিকার বলে কাজে লাগায় আর ইনসিওরেন্সের কাজে লোকসান হলে তার দায় অর্থপ্রদানকারীদের উপর তারা চাপায় না। অতএব, এটি এক প্রকার ঋণ, আর যে ঋণের পরিবর্তে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে লাভ অর্জিত হয়, ইসলামী শরিরয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিকে ইসলামী সুদ বলা হয়। কাজেই সুদের উপরই ইনসিওরেন্সের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে।

৩) তৃতীয়ত, যে সব নীতির উপর ইসলাম সমাজের ভিত্তি রাখতে চায়, বীমার নীতি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ইনসিওরেন্সকে পুরোপুরি প্রচলিত করার পর পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হত।"

(আলফযল কাদিয়ান, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪)

কিছু কিছু দেশে সরকারি আইন অনুযায়ী বিমা করানো বাধ্যতামূলক। এমন বীমা করানো বৈধ। ১৯৪২ সালের ২৫ শে জুন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কে জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে,যার কাছে গাড়ি আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইউপি সরকার তার বীমা করানো নির্দেশ দিয়েছে। এটা কি বৈধ?

হুযুর (রা.) বলেন: 'এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, এই নির্দেশ শুধু ইউপি সরকারের নয়, পাঞ্জাবেও সরকার এই একই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। এই বীমা যেহেতু আইন অনুসারে করা হয়, সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক, তাই নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, সরকারের আনুগত্যের কারণে এটি বৈধ।" (আল ফযল, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬১)

ইনসিওরেন্সের বিষয়ে ইফতা কমিটি হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ)-এর সমীপে নিম্নোক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করে, ১৯৮০ সালের ২৩ শে জুন তিনি যেগুলির মঞ্জুরী প্রদান করেন। "হযরত আকদস মসীহ তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও। তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল।') (বনী ইসরাইল: ২৪-২৫) কাজেই এই হাদীসে আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, পিতার দোয়ায় কল্যাণমণ্ডিত হও এবং তার অভিশাপ থেকে বেঁচে চল।

প্রশ্ন: গুলশানে ওয়াকফে নও লাজনা ও নাসেরাত মেলবর্ন অস্ট্রেলিয়ায় ২০১৩ সালের ১২ অক্টোবর তারিখের অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে হুযুর আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ্ তা'লাকে আমরা দেখতে পাই না কেন? এর উত্তরে হুযুর বলেন-

উত্তর: আল্লাহ্ তা'লা এমন এক সত্তা যাঁকে দেখা যায় না। (হুযুর আনোয়ার প্রশ্নকারী মেয়েটিকে ছাদে লাগানো বাল্বের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন) তুমি এই বাল্বটি দেখতে পাচ্ছ তো? আর বাল্বের আলো (হুযুর তাঁর সামনে থাকা টেবিলের দিকে দেখিয়ে বললেন) এখানে পড়তে দেখছি। এই আলো এখানে কিভাবে আসছে? আলোকে কি তুমি আসতে দেখতে পাচ্ছ? (হুযুর আনোয়ার পুনরায় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেন) সেটি বাল্বের আলো, সেখানে ওটা জ্বলজ্বল করছে আর এখানে (টেবিলের উপর) আলো এসে পড়ছে। কিন্তু মাঝের যে যে দূরত্ব আছে সেখানেও তো কোন বস্তু চোখে পড়া উচিত। সেখান থেকে শুরু করে এখানে পৌঁছে গেল, কিন্তু মাঝে কিছু দেখা যাচ্ছে কি? (মেয়েটি উত্তর দিল, দেখা যাচ্ছে না। হুযুর বললেন) দেখা যাচ্ছে না, তাই তো? আল্লাহ্ তা'লা এর থেকেও বেশি উজ্জ্বল আর তাঁর জ্যোতি এমন যা দেখা যায় না। তবে আল্লাহ্ তা'লার শক্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করা যায়। তুমি দোয়া কর, তোমার দোয়া কখনও কবুল হয়েছে? তুমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কখনও দোয়া করেছ? সেই দোয়া কি পূর্ণ হয়েছে? (মেয়েটি উত্তর দিল, জ্বি, পূর্ণ হয়েছে। হুযুর বলেন) এটিই আল্লাহকে দেখা। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, পৃথিবী, গ্রহ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং এই পৃথিবীর জীবজন্তু, গাছপালা, বনস্পতি- অস্ট্রেলিয়ার ফ্লোরা এ্যান্ড ফউনা' বেশ প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে পরিচিত- এই সব কিছু আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দেখ।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 26 Aug, 2021 Issue No.34

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(রিপোর্ট.... ৯ পাতার পর..)

কিরঘিযিস্তান

এরপর কিরঘিযিস্তানের প্রতিনিধি দল প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসে। এই দলে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন যার মধ্যে একজন ছিলেন সেখানকার জামাতের সদর আর অপর জন ছিলেন জামেয়া আহমদীয়া ঘানার ছাত্র।

সদর জামাত সালামত বেক কুশতা বায়েফ সাহেব বলেন, তিনি ২০০৬ সালে বয়আত করেন আর বর্তমানে তিনি সেখানকার সদর। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জামাতের রেজিস্ট্রেশন প্রসঙ্গে দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, চেষ্টা করতে থাকুন এবং বার বার আবেদন করতে থাকুন। কোন সময় ভাল নেতৃত্ব থাকলে হয়ে যাবে। জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন। জনসংযোগ রক্ষা প্রভৃতি প্রোগ্রামের জন্য যদি বাজেট থাকে তবে বাজেট তৈরী করুন। সদর সাহেব বলেন, কিরঘিযিস্তান জামাত হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে সালাম নিবেদন করেছে। হুযুর বলেন- 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'। তিনিও আরও বলেন, আপনার জামাতকে আমার পক্ষ থেকেও সালাম বলে দিবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সহৃদয়তাপূর্বক আশীর আলি গিয়াস সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেন এবং তিনি বলেন আপনি অনেক ভাল উর্দু শিখে গেছেন। এটি আপনার প্রথম জলসা সালানা। এটি কি ঘানার জলসার মত নয়? সেখানে পুরুষ এবং মহিলা নিজের নিজের খাদ্য পৃথকভাবে প্রস্তুত করে থাকে। কিন্তু এখানে ব্যবস্থাপনা একটু অন্য রকম। লঙ্গারখানায় কেবল পুরুষরাই রান্না করে। এখানে কিছু আইনগত বাধা রয়েছে, অপরদিকে সেখানে স্বাধীনতা রয়েছে। সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে লঙ্গারখানার ব্যবস্থাপনা চলে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সহৃদয়তাপূর্বক জামেয়া আহমদীয়া ঘানায় শিক্ষারত রাশিয়ান ছাত্রদের খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন, এ ব্যাপারে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম আর ব্যবস্থাপনা এখন পূর্বের তুলনায় উন্নত। আপনাদের রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ করুন সেখানকার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটুক। এমনটি হলে আমি আপনাদের দেশ পরিদর্শনে যাব। কিরঘিযিস্তানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি সাড়ে ছটার সময় শেষ হয়। পরিশেষে এই দুই ব্যক্তি হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে ছবি তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) সহৃদয়তাপূর্বক এঁদের দুইজনকে 'আলাইসাল্লাহ' আংটি এবং কলম উপহার দেন।

আলবেনিয়া

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের পুরুষদের অংশে পদার্পণ করেন যেখানে আলবেনিয়া থেকে আগত প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। এবছর আলবেনিয়া থেকে ৪৮জন ব্যক্তি সংবলিত প্রতিনিধি জলসায় যোগদান করেছিল যাদের মধ্যে ১৯ জন আহমদী ছিলেন এবং ২৯ জন অ-আহমদী ছিলেন। এঁরা বাসে করে ৪৩ ঘন্টার সফর করে এখানে পৌঁছে ছিলেন। এঁদের মধ্যে দুইজন সরকারি প্রতিনিধিও ছিলেন। এঁরা হলেন, লোর্টিয়া কোনোমি, চেয়ার ম্যান অফ স্টেট কমিটি অন কাল্টস এবং সারভেট গোরা যিনি উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের বোর্ডেরই কর্মী ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার সকল অতিথিদের কাছে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করেন এবং এরপর কমিটি অন কাল্টস-এর সদর সাহেবা হুযুর আনোয়ার (আই)-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আলবেনিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানটি সরকার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করে। এর কাজ হল, দেশের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়টিকে নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ার (আই.) কে প্রশ্ন করেন যে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়া কি কাজ করছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি বিভিন্ন সেমিনারে যে সমস্ত ভাষণ দিয়ে থাকি আপনি যদি তা শুনে থাকেন তবে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আমরা ধর্মীয় শান্তি ও স্থিতিশীলতার সমর্থক। সমস্ত ধর্মকে একত্রে বসে পরস্পর মত বিনিময় করা উচিত। আমরা বিভিন্ন সম্মেলনের আয়োজন করে থাকি যেখানে বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিত ও বিদ্বজনেদেরকে আহ্বান করা হয়, তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং তাঁদেরকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করে থাকি। আর আমরা এই চেষ্টা কেবল এই কয়েক বছর থেকেই করছি না, বরং জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি রচনা রয়েছে যেটি ছিল আন্তধর্মীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ। পরবর্তীকালে এই রচনাটি ইসলামী নীতিদর্শন পুস্তক নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি আপনি আমাদের কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা মানবীয় মূল্যবোধের সমর্থক এবং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা এগুলির প্রচার ও প্রসার করে থাকি। যদি না মানবীয় মূল্যবোধ থাকে তবে সঠিক অর্থে ধর্মের প্রতি নিয়মানুবর্তী হওয়া যায় না।

এরপর মিসেস কোনোমী সাহেবা প্রশ্ন করেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের বাড়বাড়ন্ত আর বিশেষ করে যুবক শ্রেণী এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আপনার জামাত এই বিষয়টির সমাধানের জন্য দোয়া ছাড়া আর কি উপায় অবলম্বন করে থাকে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমরা চেষ্টা করে থাকি যেন অ-আহমদী মুসলমানদের মধ্যেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে যায়। আমরা শান্তি সম্মেলনে অ-আহমদী মুসলমানদেরকেও আহ্বান করে থাকি। আমরা কাউকে কিছু মেনে চলতে তো আর বাধ্য করতে পারি না , না আমাদের কাছে প্রশাসনিক পর্যায়ের ক্ষমতা রয়েছে যার দ্বারা আমরা প্রশাসনিক স্তরে নিজেদের আদর্শ তুলে ধরতে পারি। কিন্তু আমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য এবং উপায় উপকরণ অনুযায়ী এই বিষয়টির বাস্তবতা মুসলমানদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এছাড়াও আমরা নিজেদের জামাতেও সঠিক ইসলামী শিক্ষা বলবৎ করার চেষ্টা করি। এই কারণেই আপনারা দেখবেন যে, কোন আহমদী যুবক উগ্রপন্থা অবলম্বন করে না।

সাক্ষাতের পর ভদ্রমহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি প্যান্ডেলের মধ্যে লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনেছি আর তাঁর সমাপনী ভাষণও শুনেছি। আমি তাঁর সমাপনী ভাষণ শুনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছি। বর্তমান যুগে যখন কি না সর্বত্রই যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বলা হচ্ছে সেখানে এমন দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শান্তির শিক্ষা প্রসার করা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আমি হুযুরের এই কথাটিকে অত্যন্ত পছন্দের দৃষ্টিতে দেখি যে, একজন মহিলাকে তার সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন পালনের জন্য সব থেকে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত।

রেক্সহেপ ডোকা সাহেব আলবেনিয়ায় একটি অ-আহমদী মসজিদের ইমাম। তিনি সাক্ষাতের সময় নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: তিন দিন যাবৎ ৪১ হাজারের অধিক পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ ছিল আর সেখানে কোন প্রকারের অব্যবস্থা অনুভূত হল না। এটিই সত্যিই প্রশংসনীয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনাদের মসজিদে কি এই ধরণের জলসা হয়? তিনি উত্তর দেন এত বিরাট আকারে তো হয় না আর এমন সুসংগঠিত ও সুব্যবস্থিতভাবেও হয় না।

আলবেনিয়া থেকে আগত দিলিপ গারগেজি সাহেব গত বছরও জার্মানীর জলসায় এসেছিলেন। হুযুর তাঁকে গত বছর ও এবছরের জলসার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, দুই বছরের জলসা-ই তাকে প্রভাবিত করেছে আর হুযুর আনোয়ার (আই.) এর ভাষণ তার মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে যার কারণে তিনি জলসার শেষ দিন বয়আত করারও সৌভাগ্য অর্জন করেন। আর বয়াআতের সময় উপস্থিত তাঁর ছেলে গত বছরই বয়আত করেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদের ঈমান ও অবিচলতার জন্য দোয়া করেন।

এরপর রেক্সহেপ ডোকা সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে প্রশ্ন করেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে লেখা আছে যে, ইমাম মাহদী পৃথিবীতে আগমণ করবেন, তিনি কিছু সময় থাকবেন এবং এরপর পরেই কিয়ামত এসে পড়বে। কিন্তু আপনরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি এসে পড়েছেন, তবে এখনও কিয়ামত কেন এল না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, কিয়ামত কখন আসবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে তো মহানবী (সা.)-কেও জানানো হয় নি। তিনি (সা.) বলেন, আমি কেবল কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখই করতে পারি। এছাড়াও ইমাম মাহদী যদি কিয়ামতের এত কাছাকাছি সময় আসেন তবে তিনি কাজ কি করবেন? তিনি যখন আলবেনিয়ায় আসবেন তখন বলবেন, আমার কাছে বেশি সময় নেই, এখন আফ্রিকার জঙ্গালে বসবাসকারী মানুষদের কাছেও যেতে হবে। এরপর তিনি বলবেন ক্রুশও ভাঙ্গার কাজও পড়ে আছে আবার শূকর বধও করতে হবে। এখানে জার্মানীতেই এত সংখ্যক শূকরের ফার্ম রয়েছে যে, এর পিছনেই তার সমস্ত সময় ব্যয় হয়ে যাবে। তাই তিনি কিয়ামতের এত কাছাকাছি সময় এসে কি করবেন? অন্যদিকে পৃথিবীর অবস্থা লক্ষ্য করুন। আজ মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন চরমে পৌঁছেছে। এত কম সময়ের জন্য ইমাম মাহদী এসে কি কাজ করবেন? (ক্রমশ....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir